বাংলাসাহিত্যে সাধারণ ভাবে 'সিদ্ধিদাতা গণেশ' রবীন্দ্রনাথ ; শিশুসাহিত্যে বিশেষ ক'রে সুকুমার রায়। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের জন্যে যেমন জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির ভূমিকা একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের, সুকুমার রায়ের সার্থকতার জন্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সমগ্র ভাবে ময়মনসিংহের রায়-পরিবারের ভূমিকাও প্রায় তেমনি। কিন্তু এতদিন বাংলাদেশে এঁদের সম্বন্ধে উন্মুখীনতা ও চেতনার পরিচয় খুব কমই দেখা গেছে।

'ছেলেবেলার দিনগুলি' সেই সব-চেয়ে উপেক্ষিত দিকে প্রথম সফল উদ্দীপনা ; নতুন আবিষ্কারের মতোই নবীনতায় প্রোজ্জ্বল। এই কাহিনী স্মৃতিসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্য, স্মৃতিচিত্রের চেয়ে বড়ো, উপন্যাসের মতো উত্তেজক। লিখেছেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী, যিনি উপেন্দ্রকিশোরের কন্যা, সুকুমার রায়ের সহোদরা।

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ও অসংখ্য চিত্রে অলঙ্কৃত করেছেন সত্যজিৎ রায়।

ছেলেবেলার
দিনগুলি

ছেলেবেলার দিনগুলি

পুণ্যলতা চক্রবর্তী
প্রণীত

সত্যজিৎ রায়
ও সুবোধ দাশগুপ্ত
অলঙ্কৃত

নিউস্ক্রিপ্ট প্রকাশিত
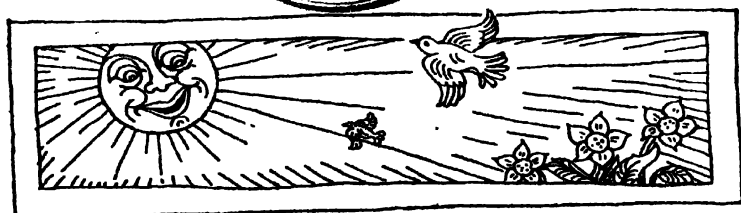
র ন্টু সো না
তো তো ম নি জো জো ম নি
বা বু সো না

"গল্প বল, দিদা।" বলে কাছে যখন আস,
শুধাই যদি "কোন্ গল্প শুনতে ভালবাস?"
"তোমার ছেলেবেলার গল্প শুনতে মোরা চাই।"
এই কথাটা বারে বারেই তোমরা বল ভাই।
কবেকার সে কথা রে ভাই—আমার ছেলেবেলা!
কত দিনের হাসি খেলা আনন্দেরি মেলা,
কত কালের পুরানো সে নানারঙের ছবি,
মনের মাঝে উজল হয়ে ফুটে ওঠে সবি;
কত প্রিয় হারানো মুখ চোখের 'পরে রাজে:
সে সব মুখের বাণী যেন আজও কানে বাজে;
মধুর স্মৃতি জড়ানো সেই সোনার দিনগুলি
মালা গেঁথে তোমাদেরি হাতে দিলাম তুলি।

দি দা

প্রচ্ছদপট: সত্যজিৎ রায়

প্রথম সংস্করণ। আশ্বিন, ১৮৮০ শকাব্দ

প্রকাশক: সুচরিতা দাশ

নিউস্ক্রিপ্ট।১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯

পরিচ্ছেদগুলির শীর্ষালঙ্করণ ও ১১-পৃষ্ঠার ছবিটি ছাড়া অন্যান্য ছবি: সত্যজিৎ রায়

পরিচ্ছেদগুলির শীর্ষালঙ্করণ ও ১১-পৃষ্ঠার ছবি: সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক: শশধর চক্রবর্তী। কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলকাতা ৫

ব্লক: রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট। ৭।১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট-মুদ্রক: দি নিউ প্রাইমা প্রেস। ১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা ১৩

বাঁধাই: ঈস্টএণ্ড ট্রেডার্স। ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯

দাম: ৩·০০ টাকা

নি বে দ ন

এই বাল্যস্মৃতির মধ্যে সু-সম্বদ্ধভাবে পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের বিবরণ দেবার চেষ্টা করিনি; স্মৃতির পটে ছবির মত যা ফুটে উঠেছিল, গল্পচ্ছলে তাই বলেছি। আমার আদরের নাতিরা এই সব গল্প শুনতে খুব ভালবাসে, তাদের জন্যই এগুলি খাতায় লিখে রেখেছিলাম—বই করবার উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের যে জিনিস ভাল লাগে, অন্য ছেলে-মেয়েদেরও হয়তো তা' ভাল লাগবে, এই বিশ্বাসে প্রকাশ করা হল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সত্যজিৎই প্রথমে এগুলি প্রকাশ করতে উৎসাহ দেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এর অধিকাংশ ছবি ও প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন। এর মধ্যে অনেক পারিবারিক নামের উল্লেখ আছে, পাঠকের সুবিধার জন্য পরিশিষ্টে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

ছেলেবেলার দিনগুলির মধুর স্মৃতি জীবনের সন্ধ্যাকালে আমার প্রাণে যেমন আনন্দ দেয়, পাঠক-পাঠিকাদের মনেও যদি একটু আনন্দ দিতে পারে, তবেই কৃতার্থ বোধ করব।

১৫ আশ্বিন ১৩৬৫

ছেলেবেলার
দিনগুলি
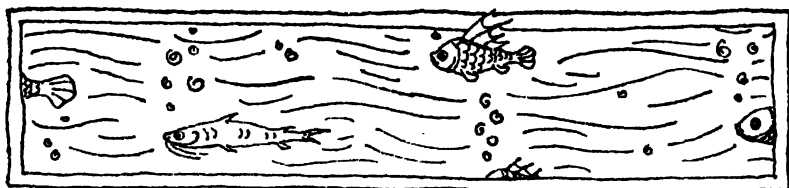
প্রথম পরিচ্ছেদ

যে বাড়িতে আমাদের জন্ম হয়েছিল আর শিশুকাল কেটেছিল, সেটা ছিল বিরাট একটা সেকেলে ধরনের বাড়ি। তার বাইরের অংশে আমাদের স্কুল হ'ত, ভিতরের অংশে, দোতলায় আমরা থাকতাম আর তিনতলায় আমাদের দাদামশাইরা থাকতেন। একতলার বাইরের ঘর, বারান্দা, আর উপরে উঠবার চওড়া কাঠের সিঁড়ির সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ছিল—পিছনে আরো কত ঘর ছিল, সেখানে কারা থাকত, সেসব ভাল করে মনে নেই। শুধু একতলার রান্নাবাড়ির উঠোনের প্রায় আধখানা জুড়ে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চাটার কথা মনে পড়ে। তা'তে একতলার লোকদের মাছ জীয়ানো থাকত, ডাব, পান, শাকের আঁটি ভাসানো থাকত, তার মধ্যে নেমে ওরা ডুব দিয়ে স্নান করত। আমাদের দোতলার রান্নাঘরের বারান্দা থেকে সব দেখতে পেতাম। অত বড় চৌবাচ্চা আজকাল আর কোনো বাড়িতে দেখতে পাই না।

দোতলার এক সারিতে আমাদের কয়েকখানি ঘর, তার সামনে মস্ত চওড়া একটা বারান্দা। ঘরের ভিতরকার কতরকম দৃশ্য ছবির মত মনে পড়ে। বাবা বেহালা বাজাচ্ছেন, ছবি আঁকছেন। মা সেলাই করছেন, ঘরের কাজকর্ম করছেন। আমরা খেতে বসেছি, মা পরিবেশন করছেন। সবাই মিলে শুতে যাচ্ছি কিম্বা কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য হৈচৈ করে তৈরী হচ্ছি—কিন্তু ঘরের চেয়ে বারান্দার

কথাই বেশী মনে পড়ে। বাইরে, রাস্তার দিকে আরেকটা বারান্দা ছিল। সেখান থেকে গাড়িঘোড়া লোকজনের চলাচল দেখতাম, তার সামনের মস্ত বড় কদমগাছটা বর্ষাকালে বলের মত গোল গোল হল্‌দে ফুলে ভরে যেত। কিন্তু ভিতরের এই বড় বারান্দাটাই ছিল আমাদের আড্ডার জায়গা। খেলাধুলা, পড়াশোনা, গল্পসল্প, বেশীর ভাগই এইখানেই হ'ত। জন্মদিন প্রভৃতি উৎসবে এইখানে সারি সারি পাত পেতে নিমন্ত্রণ খাওয়া হ'ত। সন্ধ্যাবেলায় মাঝে মাঝে অনেক ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে এখানে "ছায়া-বাজি" (Magic Lantern ও Shadow-play) দেখতাম। রোজ সন্ধ্যায় ছিল এখানে বসে গল্প শোনার পালা—কত দেশ-বিদেশের কথা, রূপকথা, রামায়ণ মহাভারতের গল্প, বাবা-মায়ের ছেলেবেলার গল্প, হাসির গল্প, দুঃখের গল্প, যুদ্ধ ও বিপদের কত রোমাঞ্চকর গল্প। শুনতে শুনতে যেন কোন্ স্বপ্ন-রাজ্যে চ'লে যেতাম। গল্পের রাজপুত্র যেমন পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, সাত-সমুদ্র তেরো-নদী পার হয়ে, 'অচিন্ দেশের অচিন্ পুরী'তে চ'লে যায়, আমাদের মনও তেমনি সম্ভব-অসম্ভব কত রাজ্যেই না উধাও হয়ে বেড়াত। যখন খাবার জন্য ডাক পড়ত, তখন আবার চম্‌কে উঠে নিজের রাজ্যে ফিরে আসতাম।

শোবার ঘরের তাকের উপরে কত খেলনা সাজানো থাকত, কিছু কিছু মনে পড়ে। এক জোড়া কৃষ্ণনগরের পুতুল, ভিস্তি আর বুড়ো ভিখারী। তাদের হাত পায়ের শিরগুলি, গায়ের প্রত্যেকটি মাংসপেশী, মুখের ভাব, চোখের ভুরু পর্যন্ত কি সুন্দর নিখুঁতভাবে তৈরী। একটা চূড়োওয়ালা রঙ্গীন গালার কৌটোর মধ্যে গালার তৈরী এলাচ-লবঙ্গ-সুপুরী—বন্ধুদের ঠকিয়ে মজা দেখতাম। একটা হাঁসের ডিম, তার ভিতরে একটা রঙ্গীন ডিম, তার ভিতরে আরেকটা ডোরাকাটা ডিম,

এমনি করে একটার পর একটা নারাঙ্গের ডিম ক্রমে ছোট হতে হতে মুসুর ডালের মত একটা ছোট্ট লাল দানাতে গিয়ে শেষ হত।

মায়ের একটা সুন্দর বাক্স ছিল, সেটা খুললেই আমরা চারদিক থেকে ঝুঁকে পড়তাম। বাক্সটার গায়ে অনেক কারিকুরি করা, ডালার ভিতরে আয়না বসানো, আর নানারকম খোপ্ কাটা। সেইসব খোপে খোপে কত আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস। লেসের মত ফুরফুরে জালি-কাটা হাতির দাঁতের পাখা, ঝিনুকের (mother of pearl) তৈরী ছোট্ট ব্যাগ, তার মধ্যে কত দেশ-বিদেশের কতকালের পুরানো

…ফিরে এসে দেখেন আমি একমনে ছবি আঁকছি…

অদ্ভুত সব টাকা পয়সা। মিনা করা, তারের কাজ করা, চন্দন কাঠের খোদাই করা, টুকিটাকি কত সুন্দর সুন্দর জিনিস—আমাদের কাছে সে-সব যেন গুপ্তরত্নের ভাণ্ডার ব'লে মনে হত।

বাবার ঘরের কোণে সুন্দর একটি মেয়ের মূর্তি ছিল, সেটি বাবার ভারি যত্নের জিনিস। বাবার একজন বন্ধু (রোহিণীকান্ত নাগ) চমৎকার মূর্তি গড়তে পারতেন। অল্প বয়সে তিনি ইটালীতে মারা যান। বিলাত যাবার আগে এই মেয়ের মূর্তিটি তৈরী করে তিনি

বাবাকে উপহার দিয়ে যান। আমি একদিন সেই মেয়েকে আদর করে বেল খাওয়াতে গিয়েছিলাম—ধব্‌ধবে সাদা মুখখানিতে সেই যে বেলের কষ লেগে গেল, কত ধুয়েও আর ভাল করে ওঠানো গেল না।

আরেকদিন, বাবা ছবি আঁকতে আঁকতে একটু ঘরের বাইরে গিয়েছেন—ঈজেলের উপরে অসম্পূর্ণ ছবি আর তার পাশেই রঙের তুলি প্যালেট্ ইত্যাদি রয়েছে। ফিরে এসে দেখেন আমি একমনে ছবি আঁকছি! সে ছবি ঠিক করে নিতে বাবাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

দিদিমা কবে যে বিলাতে গিয়েছিলেন সে-কথা মনে নেই, কিন্তু তাঁর ফিরবার দিনটি বেশ মনে পড়ে। বাড়িতে ঢুকেই দিদিমা হু'হাত বাড়িয়ে জংলুমামাকে কোলে নিতে গেলেন। ছোট্ট এক বছরের জংলুমামাকে তাঁর মায়ের কাছে রেখে দিদিমা বিলাতে চলে গিয়েছিলেন, এখন সে-ছেলে মাকে চিনতে পারছে না। শক্ত ক'রে ওর দিদিমার গলা আঁকড়ে রইল—কিছুতেই মায়ের কোলে গেল না!

তখনকার দিনে তো বেশী লোকে বিলাত যেত না, মেয়েরা তো খুবই কম যেতেন। তার উপরে দিদিমা আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে প্রথম বি. এ. পাশ করেন এবং মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ ক'রে বিলাত যান। বিলাত থেকে উপাধি নিয়ে তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন দেশের লোক খুব আনন্দ আর গৌরব বোধ করলেন এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব মিলে বাড়িতে বেশ একটা উৎসবের সাড়া প'ড়ে গেল। আমাদেরও আনন্দের সীমা রইল না, সুন্দর সুন্দর খেলনা, পুতুল, ছবির বই ইত্যাদি উপহার পেয়ে। ছোট বড় সকলের জন্যই দিদিমা কিছু-না-কিছু উপহার এনেছিলেন।

দিদিমা বিলাত থেকে ফিরলেন, নতুন কায়দায় তাঁর ড্রইং-রুম

সাজানো হ'ল। দেশ-বিদেশ থেকে আনা কত রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস! আমরা সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে, আস্তে আস্তে সে-সব নেড়ে চেড়ে দেখতাম। দাদামশাইর ঘরের কোণে তাঁর লাঠিগুলো সাজানো থাকত। একটা ছিল বুল্‌ডগমুখো মোটা লাঠি, হল্‌দে কাঁচের চোখওয়ালা বুল্‌ডগ্‌টা দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে। আরেকটা ছিল দারচিনি ডালের তৈরী লাঠি, সেটা কামড়ালেই দারচিনির স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যেত। আমাদের দাঁত ব'সে ব'সে সেটা একেবারে বাদাম খোলার মত এব্‌ড়ো-থেব্‌ড়ো হয়ে গিয়েছিল। আর তাঁর সেই পিঠ চুলকোবার ডাণ্ডাটা! কচি ছেলের হাতের মত ছোট সুন্দর সাদা হাতির দাঁতের তৈরী একটা হাত, ঘরে ঢুকলেই সেটা দিয়ে একবার পিঠ চুলকে নিতাম।

বাড়িতে কয়েকটা ঘর ছিল যাতে আমরা ছোটরা ঢুকতাম না। গল্পে যেমন শোনা যায় বিশাল রাজপুরীর কোনো একটা ঘর তালাবন্ধ, তার ভিতরে কি আছে কেউ জানে না, তেমনি এই ঘরগুলোর মধ্যে কি আছে ভাল ক'রে জানতাম না ব'লেই মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় মেশানো কৌতূহল থাকত। একটাকে আমরা বলতাম 'কঙ্কালের ঘর'; তার দেওয়ালে আস্ত একটা মানুষের কঙ্কাল ঝুলত, আলমারীতে মোটা মোটা বই, তাকের উপর সারি সারি শিশিবোতল আর কি-সব যন্ত্রপাতি। আসলে এটা ছিল আমাদের ডাক্তার দিদিমার পড়াশোনার ঘর। আরেকটা ছিল 'অন্ধকার ঘর', তার চারিদিক বন্ধ। ভিতরে লাল কাচের ঝাপ্‌সা ভুতুড়ে আলোয় আবছায়া দেখা যেত, বড় বড় সাদা চৌকোনা ডিশ্‌, আরো অনেক শিশিবোতল ও যন্ত্রপাতি। এটা ছিল ফটোগ্রাফির 'ডার্ক-রুম্‌'। আমরা চৌকাঠ থেকে উঁকি মেরে এ-সব দেখতাম, ভিতরে ঢুকতাম না।

বড়দিদিমার (মার পিসিমা) ঘরে ঢোকাও আমাদের বারণ

ছিল। সেখানে কিন্তু ভয়ের কিছুই ছিল না বরং লোভের অনেক কিছু ছিল। পাছে আমরা জুতো পায়ে কিংবা নোংরা হাতে বড়দিদিমার পূজোর জিনিসপত্র নষ্ট ক'রে ফেলি সেই জন্য তিনি না ডাকলে তাঁর ঘরে ঢোকা মানা। বড়দিদিমা যখন পূজোয় বসতেন, তখন আমি আর আমার প্রিয় সাথী চামি-মাসী রোজ দরজার গোড়ায় ব'সে দেখতাম। গঙ্গামাটি দিয়ে শিব গড়া, মন্ত্র পড়া, ঘণ্টা নাড়া, ফুল-চন্দন-বেলপাতা দেওয়া, কোশাকুশী ক'রে গঙ্গাজল ঢালা, সবই চমৎকার লাগত, কিন্তু যেই বড়দিদিমা ববম্ বম্ ক'রে গাল বাজাতেন, অমনি ভয়ানক হাসি পেত! মা বলেছিলেন হাসতে নেই, তাই দু'জনে ছুটে লম্বা বারান্দার অন্যদিকে পালিয়ে গিয়ে বেশ একচোট হেসে নিয়ে আবার শান্ত হয়ে বসতাম। স্নান ক'রে পূজো সেরে, বড়দিদিমা খেতে বসতেন। আমরা দু'জনে প্রসাদ পেতাম। পাথরের বাটিতে ঘনদুধ ও কলা দিয়ে ভাত মাখতেন, পায়েসের মত খেতে সেই সুগন্ধি চালের দুধভাতের উপর আমাদের ভারি লোভ ছিল। আর লোভ ছিল আমসত্ত্বের! বড়দিদিমা প্রতিবৎসর কাশী থেকে ক্যানেস্তারা ভর্তি আমসত্ত্ব তৈরী ক'রে আনতেন। বড় বড় থালার মত গোল আমসত্ত্ব, চাটাইয়ের মত দাগকাটা চৌকোনা আমসত্ত্ব, সুন্দর ছাঁচে ঢালা ফুলকাটা আমসত্ত্ব। আমাদের সবাইকে ভাগ ক'রে দিতেন।

বড়দিদিমার জন্য 'ভারী' রোজ গঙ্গাজল দিয়ে যেত। কাঁধের উপর বাঁশের ভারে দুইদিকে দুই কলসী ঝুলিয়ে ঝুঁটি-বাঁধা লোকটা যেই আসত, অমনি আমরা ছুটে যেতাম। জলে কত কুটো কাটা ভাসে তাই কাপড়ে ছেঁকে নেওয়া হ'ত, তার সঙ্গে ক্ষুদে ক্ষুদে কাঁকড়ার ছানা বেরোত —আমরা সেগুলোকে নিয়ে গামলায় জল দিয়ে পুষতাম। একটু বড় হলেই কিন্তু তারা গামলার কানা বেয়ে উঠে কে কোথায় পালিয়ে যেত।
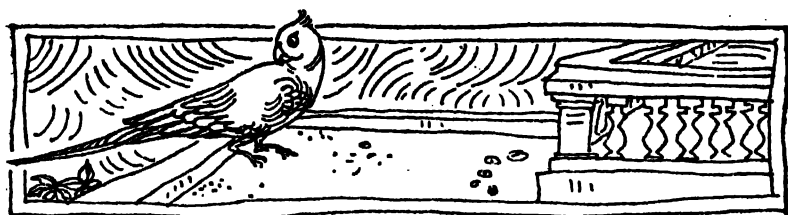
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন আমরা পাঁচ ভাইবোন। দিদি (সুখলতা, ডাকনাম হাসি) সবার বড়, আর খুব শান্তশিষ্ট। ছেলেবেলায়ও দিদিকে কখনও চেঁচামেচি করতে কিম্বা হুড়োহুড়ি করে খেলতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শুনেছি ছোটবেলায় নাকি দিদির খুব অসুখ করেছিল। হাঁটতে এবং কথা বলতে শিখেও অসুখের জন্য ভুলে গিয়েছিল, আবার দাদার সঙ্গে সঙ্গে শিখতে আরম্ভ করল। সেইজন্যেই বোধ হয় দিদির মধ্যে কেমন যেন একটু ভীরু করুণ ভাব ছিল। তারপরে দাদা আবার তেমনি চঞ্চল আর স্ফূর্তিবাজ। সব কিছুতেই দাদার উৎসাহ, খেলাধুলায় সে-ই আমাদের পাণ্ডা। ছোট্ট-বেলা থেকেই না কি দাদা খুব চঞ্চল ছিল। তার কলের খেলনা-গুলো সে ঠুকে ঠুকে ভেঙ্গে দেখত কি করে চলে। বাজনাগুলো ভেঙ্গে দেখবার চেষ্টা করত কোথা থেকে আওয়াজ বেরোয়। ছোট্ট লাঠি হাতে বোর্ডিংয়ের মেয়েদের ছাতময় তাড়া করে বেড়াত। প্রকাণ্ড তিনতলার ছাতের একদিকে পাঁচিলটা খুব উঁচু ছিল, তার মধ্যে খানিক উঁচুতে একটা গোল ফুটো ছিল। দাদা একবার নাকি সে ফুটো দিয়ে গলে বাইরের কার্নিসে নামবার চেষ্টা করেছিল—শুধু ছোট্ট একখানি জুতো-পরা পা ভিতর দিকে ছিল। হঠাৎ আমাদের বড়মামা দেখতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে পা-টা ধরে ফেলে চিৎকার করে সবাইকে ডাকলেন।

দাদার পরে আমি। আমিও খুব চঞ্চল ছিলাম। আমার মাথার চুল কেন জানি না, অনেকদিন পর্যন্ত ছেলেদের মত ছোট করে কাটা ছিল। আমার পরে মণি (সুবিনয়) ছিল ধবধবে ফর্সা, নীল চোখ, মাথাভরা চুল—আমার চেয়ে তাকেই বেশী মেয়ের মত দেখাত। খেলার মধ্যে অনেক সময় মণিকে আমার ফ্রক ও হার বালা পরিয়ে, চুলে রিবন বেঁধে, মেয়ে সাজিয়ে দিতাম। তার পরে টুনী (শান্তিলতা) ছিল ডলপুতুলের মত ফুটফুটে সুন্দর—তাকে যে দেখত সেই আদর করত।

··ছোট্ট লাঠি হাতে বোর্ডিংয়ের মেয়েদের ছাতময় তাড়া করে বেড়াত···

টুনীর পরে আমাদের একটি বোন জন্মিয়ে অল্প পরেই মারা যায়। "ছোট্ট বোনটি এসেই আবার চলে গেল কেন?" আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির করলাম, "আমরা তো একটি করে বোন একটি করে ভাই, টুনীর পরে তাহলে এবার ভাই আসবার পালা—ভগবান নিশ্চয় ভুল করে ভাইয়ের বদলে বোন পাঠিয়ে ছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিলেন।" কিছুকাল পরে যখন ছোটভাই নানকুর জন্ম হল, তখন আমরা খুশী আর নিশ্চিন্ত হলাম যে, এবারে আর ভগবানের হিসাবে ভুল হয়নি।

আমরা কয়টি ভাইবোন, আর সুরমামাসী—মাসী হলেও কিন্তু দিদির চেয়ে মোটে দু বৎসরের বড়, সুতরাং—ছোটদের দলে। ছোটদের মধ্যে সব চেয়ে বড় তো! মাসী আমাদের খুব ভালবাসত, আমাদের কত আব্দার উৎপাতও সহ্য করত। একবার দাদা খেলতে খেলতে সুরমামাসীর মুখে এক ব্যাটের বাড়ি লাগিয়ে দিল। মাসীর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কিন্তু যেই বাবা দাদাকে শাসন করতে গেলেন অমনি হাত তুলে মানা করল "বেশী লাগেনি! বেশী লাগেনি!" সুরমামাসীর ছোট্টবেলায় ওর মা মারা গিয়েছিলেন, বাবা সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় এলেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। প্রকাণ্ড দাড়ি, মাথায় লম্বা লম্বা পাকানো পাকানো লাল জটা, গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা—দেখলেই কিরকম ভয় হত। তিনি কিন্তু আমাদের কাছে টেনে নিতেন, হাসিঠাট্টা করতেন, আর গল্প বলতেন। কত দেশ ঘুরেছেন—আসামে, তিব্বতে, হিমালয়ের কত দুর্গম জায়গায় পায়ে হেঁটে গিয়েছেন, কত আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছেন, কত বিপদের মুখে অদ্ভুতভাবে রক্ষা পেয়েছেন, নানারকম লোকের সঙ্গে দেখা, কত মজার মজার ঘটনা। আমরা হাঁ করে সে সব শুনতাম।

আমরা ক'টি ভাইবোন আর আমাদের প্রায় সমবয়সী মামা মাসীরা একসঙ্গে খেলাধূলা আর লেখাপড়া করতাম। বিকালে ছাতে উঠলে, বোর্ডিংয়ের ছোট ছোট মেয়েরাও খেলার সাথী জুটত, প্রকাণ্ড ছাতে খেলাটা জমত বেশ ভালই। লুকোচুরি, চোর-চোর, কুমীর-কুমীর, কানামাছি, এসব খেলা তো ছিলই, তাছাড়া মন থেকে বানিয়ে কতরকম খেলা হত—নতুন নতুন খেলার কল্পনা দাদার মাথায় খুব আসত।

খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও ঘটে যেত—বড় ছাতের

খানিকটা জায়গায় পাঁচিল খুব নীচু ছিল বলে, সেদিকে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল। একদিন একটা টিয়াপাখী উড়ে এসে যেই না সেই ন্যাড়া ছাতে বসেছে, অমনি আমরা নিষেধ ভুলে সেইদিকে ছুটেছি; তিন বছরের টুনী, 'তিয়াপাকি!' 'তিয়াপাকি!' বলে নাচতে নাচতে হঠাৎ সেই দোতলার ছাত থেকে একতলার ছাতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল! মা ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন—'জল আনো' 'বরফ আনো' 'বাতাস করো' 'ডাক্তার ডাকো' ছুটোছুটি পড়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হয়ে চোখ মেলেই টুনী ঠোঁটে হাত দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞাসা করল 'আমাল মুকে কি?' বেচারার নাক-মুখ ভীষণ কেটে ফুলে গিয়েছিল।

আরেকদিন টুনী এক কাণ্ড করেছিল। সে কোথা থেকে একটা ব্যাগ হাতে করে ডাক্তার সেজেছে। জংলুমামা উপুড় হয়ে শুয়েছিল, তার কাছে গিয়ে বলছে 'ইস্‌! তোমার পিঠে ম-স্ত-ব-ড় ফোড়া!' বলেই, একটা ছুরি বার করে ঘ্যা-চ্‌ করে ফোড়া কেটে দিয়েছে। ভাগ্যে ছুরিটা উল্টো করে ধরেছিল! ভোঁতা দিকটা বসিয়েছিল, তবু একেবারে কাঁধ থেকে কোমর অবধি বেশ গভীর একটা আঁচড় কেটে ফেলেছিল।

একদিন রাত্রে আমরা ঘরে বসে আছি, হঠাৎ বারান্দাটা খুব আলো হয়ে উঠলো। বেরিয়ে দেখি, বারান্দায় লণ্ঠনটা কাত হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে আর চামিমাসী ছুটোছুটি করছে—তার কাপড়েও আগুন। আলো নিয়ে খেলা করতে করতে কি করে যেন সেটা উল্‌টিয়ে আগুন ধরে গিয়েছে। ভয়ে সে চেঁচাতেও পারছে না—শুধু ছুটছে। সুন্দরকাকা ছুটে গিয়ে তার জামা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, থাব্‌ড়িয়ে আগুন নিভিয়ে দিলেন, তাই সে বেঁচে গেল। কাকার হাতে কিন্তু বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেল।

আরেকদিন বাড়ি মেরামত করবার জন্য চুন বালি সুরকি এনে উঠোনে গাদা করা হয়েছে, আমরা সেগুলোকে পাহাড় কল্পনা করে লাফালাফি খেলছি। চুণের গাদাটা হয়েছে বরফঢাকা হিমালয় পর্বত। হঠাৎ ভুলুমামা একলাফে হিমালয় ডিঙোতে গিয়ে ধ-পা-ৎ করে একেবারে চুণের গাদার মধ্যে তলিয়ে গেল। যখন তাকে বার করা হল, তখন তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা, নাকে মুখে চোখে চুণ ঢুকেছে, চেঁচাতে পারছে না, শুধু চোখমুখ বুজে গোঁ গোঁ করছে। তখনই চৌবাচ্চায় চুবিয়ে তাকে ধোওয়া হল।

আরেকটা দুর্ঘটনার কথা মনে করলেই হাসি পায়। একদিন

…ভুলুমামা এক লাফে হিমালয় ডিঙোতে গিয়ে ধ-পা-ৎ…

আমরা বারান্দায় বসে আছি, দেখলাম বড় মা (দিদিমার মা) এক হাঁড়ি দই নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকলেন। দইটা ঘরে রেখে, দরজায় শিকলি তুলে দিয়ে চলে গেলেন। মংলুমামা ছিল পেটুক মানুষ; কতক্ষণে খাবার সময় হবে, আর তার সবুর সইছে না। একটু নিরিবিলি হতেই, তাড়াতাড়ি একটা টুলে চড়ে শিকলি খুলে, চুপি চুপি খাটের তলা থেকে হাঁড়িটা টেনে নিয়ে মস্ত এক খাবল দই মুখে পুরে দিয়েই

বাপ্‌রে সে কি বিষম চীৎকার! আসলে, সেটা দই ছিল না,—ছিল পানে খাবার চুণ! পানে চুণ বেশী হলে কি রকম মুখ পুড়ে যায় জান তো? নতুন চুনের আবার ঝাঁজ খুব বেশী হয়, তারই এক খাবল মুখে দিলে কি দশা হয় বুঝতেই পারো। বেচারার দই খাওয়া তো দূরের কথা ক'দিন কিছুই প্রায় খেতে পারল না, তার উপরে চুরি করে খেতে গিয়ে ধরা পড়ার লজ্জা।

মংলুমামার আরেকটা মজার কাণ্ড মনে পড়ছে। একদিন মংলুমামা একটা গেলাসে জল দিয়ে, তার মধ্যে ছোট্ট একটা জ্যান্ত মাছ নিয়ে চলেছে পুষবে বলে। সামনে ছোটকাকাকে দেখেই আবদার ধরল, "গল্প বলো।" ছোটকাকা চমৎকার গল্প বলতে পারতেন, রোজ সন্ধ্যার সময় কত ভাল ভাল বই থেকে আমাদের সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতেন। তিনি তামাসা করে বললেন, "ঐ মাছটা যদি খেতে পারিস তাহলে গল্প বলব।" ও মা! যেই না বলা, অমনি মংলুমামা একগাল জল নিয়ে সেই জ্যান্ত মাছটাকে কোঁৎ করে গিলে ফেলল।

ছোটবেলা থেকেই দাদাও চমৎকার গল্প বলতে পারত। বাবার প্রকাণ্ড একটা বই থেকে নানা জীবজন্তুর ছবি দেখিয়ে টুনী মনি আর আমাকে অনেক আশ্চর্য আর মজার গল্প বলত। বইয়ের গল্প ছাড়াও নিজের মনগড়া কত অদ্ভুত জীবের গল্প—মোটা 'ভবন্দোলা' কেমন দুলেদুলে থপথপিয়ে চলে, 'মস্ত পাইন' তার সরু লম্বা গলাটা কেমন পেঁচিয়ে গিঁট পাকিয়ে রাখে, গোলমুখো ড্যাবাচোখো 'কোম্পু' অন্ধকার বারান্দার কোণে, দেয়ালের পেরেকে বাদুড়ের মত ঝুলে থাকে। এখন যেমন তোমরা 'কুমড়োপটাস্' 'রামগরুড়' 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা'—এদের গল্প শুনে আমোদ পাও, আমরাও তখন ঐ সব অদ্ভুত জীবের গল্প শুনে আমোদ পেতাম।

মজার অভিনয় করতেও দাদা খুব ভালবাসতো। ছোটদের জন্য

লেখা যত মজার কবিতা কাগজে বেরোত, দাদা সব মুখস্থ করে ফেলত। টুনি মণি তখন নেহাৎ ছোট ছিল; আমাকেই দাদা সেই কবিতা শিখিয়ে দিত। বিকালে যখন ছাতে অনেক লোক জমা হত, তখন দুজনে 'ইঁদুর ভায়া' 'নাপতে-ভায়া' 'গণেশবাবু' ইত্যাদি মজার কবিতা বিচিত্র মুখভঙ্গীর সঙ্গে অভিনয় করে সবাইকে হাসাতাম। কত রকম মুখভঙ্গীই যে দাদা করতে পারত! হাসিমুখ, কান্না মুখ, রাগ মুখ, ভয় মুখ, ন্যাকা মুখ, বোকা মুখ, অদ্ভুত বিকট মুখ। দেখে সবাই হেসে কুটিপাটি হত আর অবাক হ'ত যে অমন সুন্দর মুখখানিকে কি করে এমন অদ্ভুত হাস্যকর ভাবে বিকৃত করতে পারে।

প্রকাণ্ড ছাতটা যে শুধু আমাদের খেলার মাঠ ছিল তা নয়, ঘোড়ারও চরবার মাঠ ছিল সেটা। দিদিমা একবার নেপালের রাজ-মাতাকে চিকিৎসা করে মরণাপন্ন অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁরা খুশী হয়ে নির্দিষ্ট টাকার উপরেও আরো অনেক দামী দামী উপহার দিলেন। কত হীরে সোনার গহনা, রূপোর বাসন, ভাল ভাল পোশাক, মৃগনাভি, পিতল তামা ও হাতির দাঁতের তৈরী কি সুন্দর সুন্দর জিনিস, আর সুন্দর বেঁটে গোলগোল সাদা একটি নেপালী টাট্টু ঘোড়া! পাহাড়ী ঘোড়া, কলকাতা শহরে বেচারা পাহাড় কোথায় পাবে; সন্ধ্যাবেলায় আমাদের খেলাধূলা হয়ে গেলে, সহিস তাকে ছাতে নিয়ে যেত! দিব্যি খুটখুট করে সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে, সে ছাতে বেড়াত।

তা ছাড়া, কত যে নিমন্ত্রণ খাওয়া হত ঐ ছাতে! পাড়ার যত বিয়েবাড়ির খাওয়া, প্রায় সবই ওখানে হত। বছরের মধ্যে আমাদের একটা খুব আনন্দের দিন ছিল 'বালক-বালিকা সম্মিলন'। সামনেই আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দির। মাঘোৎসবের সময় ছোটদের উৎসবের দিনে, মন্দিরে উপাসনার পরে আমরা কয়েক শ' ছেলেমেয়ে রাস্তা পার

হয়ে এসে এই ছাতে সারি সারি পাত পেড়ে নিমন্ত্রণ খেতে বসতাম। হাসিগল্প আনন্দ কোলাহলের মধ্যে আমাদের উৎসব শেষ হত। তারি মধ্যে মনে পড়ে, নীলচোখ সোনালী চুল, ধুতিপরা একটি সাহেব আমাদের মাঝখানে বসে দু'হাতে লুচি ছিঁড়ে খাচ্ছেন আর সকলের দিকে চেয়ে হাসছেন। সুদূর নরওয়ে দেশ থেকে এসেছেন, বাংলা তো জানেনই না, ইংরাজীও ভাল জানেন না। হাসি দিয়েই সকলের সঙ্গে ভাব করে নিচ্ছেন।

কিছুদিন পরে হঠাৎ শুনলাম, সাহেব কি অসুখ হয়ে মারা গিয়েছেন। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে তাঁকে যখন নিয়ে গেল, আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম। সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে গান গাইতে গাইতে অনেক লোক মিলে তাঁকে শশ্মানে নিয়ে চলেছে —তাঁর ঝাঁকড়া লোমওয়ালা পোষা কুকুরটাও সঙ্গে চলেছে। সবাই সাহেবের জন্য দুঃখ করছিল, আমাদের কিন্তু সাহেবের চেয়েও কুকুরটার জন্যই বোধ হয় বেশী দুঃখ হচ্ছিল।
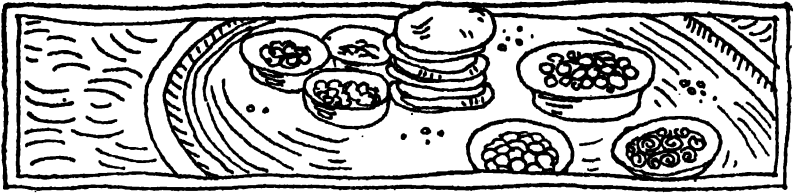
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাদাদিদিরা যখন স্কুলে যেতো, আমিও সঙ্গে যাবার জন্য আব্দার করতাম। পাঁচ বৎসর বয়সে আমিও স্কুলে ভর্তি হলাম। বাড়ির মধ্যেই স্কুল। বেশ মজা, এ দরজা দিয়ে বেরিয়ে ও দরজা দিয়ে ঢুকলেই হল। প্রকাণ্ড বড় উঠোন, তার তিনদিক ঘিরে লম্বা লম্বা ঘর আর বড় বড় থামওয়ালা বারান্দা। অন্যদিকে পুজোর দালান। একতলায় স্কুল, দোতলায় বোর্ডিং ছিল। ছোটদের ক্লাশ হত পুজোর দালানে। তার থাম ও খিলানের মাথায়, কার্নিসের নীচে, সুন্দর লতাপাতা খোদাই করা। সাদা-কালো মার্বল পাথরের মেজের উপর জানালার রঙ্গীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে রামধনুর মত রঙ্গীন আলো এসে পড়ত, ভারি ভাল লাগত আমার এই ঘরটি।

এখন ছোটদের পড়বার জন্য কত সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা বই হয়েছে, আমাদের সময়ে এত সব ছিল না। অধিকাংশ বইয়ের ছবিও ভাল নয়, ভাষাও শক্ত কটমট ছিল। দুয়েকজন শিক্ষয়িত্রী বেশ সুন্দর গল্পের মত করে সব বুঝিয়ে দিতেন, তাঁদের ক্লাস খুব ভাল লাগত। একজন মাস্টারমশাই ছিলেন ভয়ানক রাগী। যতই মজার কথা হ'ক না কেন, একটু যদি হেসে ফেলেছি, অমনি এক ধমক দিতেন। বইয়ে ছিল "ময়ূরের কেকারব"। মাস্টারমশাই ক্লাসের একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ময়ূর কিরকম করে ডাকে?"

ছেলেটি ময়ূরের ডাকের চমৎকার নকল করল। তক্ষুনি মাস্টারমশাই তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন—"অত জোরে ডাক্‌লে ক্যান্?" এই মাস্টারমশাই "দাঁড়া" বলতে পারতেন না, বলতেন "দারা"। আমরাও যখন স্কুল-স্কুল খেলা করতাম তখন মাস্টার সেজে খেলার ছলে ছাত্রদের শাসন করে বলতাম—"দারা! দারা! দারাইয়া থাক্!" উপরের ক্লাসে কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, যাঁরা খুব ভাল পড়াতেন। একটু বড় হয়ে যখন তাঁদের হাতে পড়লাম, তখন থেকে পড়াশুনা সত্যিই ভাল লাগল। একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন যেমন ফর্সা ও লম্বা-চওড়া, তেমনি কড়া ছিল তাঁর শাসন। কট্‌মট্ করে যার দিকে তাকাতেন তার মুখ শুকিয়ে যেত, বুক দুরদুর করত। দুষ্টু ছেলেমেয়েরা তো তাঁকে যমের মত ভয় করত। কিন্তু গল্প বলতে যখন বসতেন,তখন তিনি যেন একেবারে অন্য মানুষ! "নীতি-শিক্ষা"র ক্লাসে কি সুন্দর করে যে নানা গল্প কবিতা আর জীবন চরিতের মধ্যে দিয়ে আমাদের নীতিকথা শোনাতেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম—ক্লাস করছি বলে মনেই হ'ত না।

গানের ক্লাসটাও বেশ ভাল লাগত। কতরকম সুন্দর সুন্দর গান, প্রার্থনার গান,খেলা ও অভিনয়ের গান, হাসির গান,এখনও তার কিছু-কিছু মনে আছে। একটি ছেলে সুন্দর গান করত, কিন্তু গাইবার সময় এমন অদ্ভুত মুখ করে মাথা নাড়ত যে, ক্লাসসুদ্ধ ছেলেমেয়ে হো-হো করে হেসে উঠত। গানের টিচার তাকে সামনে নিয়ে, আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়ে তাঁর মুখোমুখি করে বসালেন। যেই মুখ বেঁকায় অমনি ইশারা করে তাকে সাবধান করে দেন। এমনি করে তার সে মুখ বেঁকান অভ্যাস সেরে গেল।

স্কুলবাড়িতে বাগান কিংবা মাঠ ছিল না, প্রকাণ্ড উঠোনেই আমাদের খেলা হ'ত। মাঝে মাঝে একজন মেম-সাহেব এসে নানা-

রকম খেলা শিখিয়ে যেতেন। খেলার সঙ্গে সুর করে কি সব ইংরাজী ছড়া ছিল—("Sally Sally Water," "Darn, Darn, thread the needle" ইত্যাদি), সেসব খেলা বেশ ভালই লাগত। কিন্তু তার চেয়ে চোর-চোর, হাডুডু ইত্যাদি হুড়োহুড়ি খেলাই আমাদের, (বিশেষ করে ছেলেদের) বেশী ভাল লাগত। বারো বছর অবধি ছেলেদেরও স্কুলে নেওয়া হত. সুতরাং অধিকাংশ মেয়েদের ভাইরাও এ স্কুলেই পড়ত। যে সব মেয়েরা হুড়োহুড়ি ভালবাসত না, তারা বসে বসে পুতুল খেলত। একদল দুষ্টু ছেলে ডাকাত সেজে তাদের সব জিনিস লুটপাট করে নিত। ওরা শুধু হাঁউমাউ করে কাঁদতো, আমরা কয়েকজন "দস্যি মেয়ে" গিয়ে ডাকাতের হাত থেকে ওদের রক্ষা করতাম। এছাড়া "স্কিপিং," "টাগ্ অফ্ ওয়ার", "হাই জাম্প্", "লং জাম্প্", এসব তো হ'তই। একজন খুব লম্বা ছেলে অসম্ভব রকম লাফাতে পারত। "ক্যাঙ্গারু দেখবে ?" বলে সেহুই হাঁটু মুড়ে, হাত দুটোকে বুকের কাছে গুটিয়ে, গলা লম্বা করে, মুখটাকে বাড়িয়ে দিয়ে, হু-স্ করে এমন প্রচণ্ড লাফ দিত যে, সবাই অবাক হয়ে যেত। এ ছেলেটি কে জানো ?বড় হয়ে ইনিই হয়েছিলেন প্রসিদ্ধ দেশনেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

টিফিনের ছুটির সময় বারান্দার কোণে কৈলাস ময়রা প্রকাণ্ড একটা বারকোশের উপর ঝক্‌ঝকে কাঁসার বড় বড় জামবাটিতে ভরা নানারকম খাবার নিয়ে তার দোকান সাজিয়ে বসত। আজকাল তোমরা দু' আনা দিয়ে ছোটখাটো একটা সন্দেশ কিংবা রসগোল্লা পাও, তখন দু' আনাতে একটি ছেলের বেশ ভালরকম জলখাবার হয়ে যেত। চার পয়সায় চারখানি লুচি আর পরিমাণ মত ডাল কিংবা তরকারি (কিংবা সিঙ্গাড়া বা কচুরি যা চাও), আর দু' পয়সা করে দুটি সন্দেশ বা অন্য মিষ্টি।

স্কুলের প্রাইজের দিনটি ছিল ভারি আনন্দের। কতদিন আগে থেকে তার জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলত। গান শেখানো, আবৃত্তি ও অভিনয় শেখানো, কেমন করে মেম-সাহেবের হাত থেকে প্রাইজ নিতে হয়, তাও শেখানো। লাট সাহেবের সামনে আদবকায়দাদুরস্ত হওয়া চাই তো? তাই আমাদের আগে থেকে সব কায়দা-কানুন শিখিয়ে দেওয়া হ'ত। একজন টিচার চেয়ারে বসতেন, আমরা তাঁর সামনে গিয়ে প্রাইজ নেওয়া প্র্যাক্‌টিস্ করতাম—"নাম ডাকতেই এগিয়ে যাবে, দেরি করবে না। আবার বেশী তাড়াতাড়ি হুড়মুড়িয়েও যাবেনা, সামনে গিয়ে মাথা নীচু করে 'বাও' (bow) করবে—হাত পেতে প্রাইজটা নিয়ে, আবার 'বাও' করবে। খবরদার যেন মেম-সাহেবের দিকে পিছন ফিরো না। তাঁর দিকে মুখ করে, আস্তে আস্তে কয়েক পা পিছু হটে আসবে।" একবার একটি ছোট্ট মেয়ে বেশ কায়দা-মাফিক্ গিয়ে 'বাও' করে দাঁড়াল, কিন্তু যেই মেম-সাহেবের হাতে সুন্দর একটা পুতুল দেখল আর স্থির থাকতে পারল না। পুতুলটাকে মেম-সাহেবের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে এমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল যে, সভাসুদ্ধ লোক হেসে লুটোপুটি।

সেইসব জমকালো দিনের কথা মনে পড়ে—স্কুলবাড়ি ফুল পাতা নিশান দিয়ে সাজান হয়েছে, আমরাও সেজেগুজে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছি গোলাপী সিল্কের শাড়ি পরে, গোলাপী রিবন প্রজাপতির মত করে চুলে বেঁধে আমার নিজেকে বেশ বড় বড় মনে হচ্ছে (সেই আমার প্রথম শাড়ি পরা)। সামিয়ানার নীচে সারি সারি চেয়ারে সভার লোকেরা বসেছেন, বেদীর উপরে সিংহাসনের মত চেয়ারে লাটসাহেব ও তাঁর মেম-সাহেব বসেছেন। মেম-সাহেবের হাতে প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া। লাটসাহেবের পরনে সাধারণ স্যুট কিন্তু তার পিছনে যে "এডিকং" দাঁড়িয়েছে তার সোনার ঝালর দেওয়া জমকালো

পোষাক, কোমরে তলোয়ার ঝোলানো। ছোটদের মধ্যে অনেকে তাকেই লাটসাহেব মনে করেছে। গান, আবৃত্তি, অভিনয়, বক্তৃতার শেষে পুরস্কার বিতরণ। পুরস্কার হয়তো তেমন কিছুই নয়। পুতুল, খেলনা, কিংবা একটা বই। কিন্তু তার মধ্যেই কত আনন্দ!

আরেকটা আনন্দের দিন ছিল, স্কুলের জন্মদিন। সেদিন আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানায়, শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনসে কিংবা অন্য কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হ'ত। এতগুলি ছেলেমেয়ে মিলে কলরব করতে করতে রিজার্ভ ট্র্যামে কিংবা নৌকোয় যাওয়া, সারাদিন হৈ-চৈ, গান ও খেলা, গাছতলায় সারি সারি বসে খাওয়া, সন্ধ্যার সময়

…একটা বাঁদর হাত বাড়িয়ে একটি ছেলের হাত এমন শক্ত করে ধরল…

দল বেঁধে বাড়ি-ফেরা—ভারি আনন্দে কাটতো দিনটা। মাঝে মাঝে একেকটা মজার কাণ্ডও ঘটত। একবার চিড়িয়াখানায় একটা বাঁদর একটি মেয়ের লাল শাড়ি দেখে এমনি পছন্দ করল যে, আঁচলটা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে নিজের গায়ে জড়িয়ে বসল। আরেকবার একটা বাঁদর হাত বাড়িয়ে একটি ছেলের হাত এমন শক্ত করে ধরল যে, ছাড়ানো মুশকিল! সবাই তাকে ঠাট্টা করে বলতে লাগল—"এত লোক থাকতে তোকেই কেন পছন্দ করল বল্ তো? নিজের জাতের লোক বলে চিনতে পারল বুঝি?" একবার একটি মেয়ে গঙ্গার ঘাটে ঝুপ্

করে জলে পড়ে গেল। তখনই তাকে টেনে তোলা হল, কিন্তু তার জামাকাপড় জলে কাদায় একাকার। কি আর করা যায়? একটা ছেঁড়াকাপড় দিয়ে লুচির ঝোড়াটা বেঁধে আনা হয়েছিল, সেটাই জড়িয়ে তাকে বসে থাকতে হ'ল।

গ্রীষ্ম আর পূজার ছুটির জন্য যেদিন স্কুল বন্ধ হ'ত, সেদিন আমরা চাঁদা করে খাওয়াদাওয়া করতাম। বড় মেয়েরা রান্না করত, আমরা কাজে সাহায্য করতাম। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের খাইয়ে, তারপর নিজেরা একসঙ্গে বসে খুব আনন্দ করে খেতাম।

সেই আমাদের স্কুল এখন কত বড় আর প্রসিদ্ধ হয়েছে। এখন তার সুন্দর বাগান আর খেলার মাঠের মধ্যে মস্ত বড় বাড়ি, অনেক ছাত্র-ছাত্রী। দেখে কত আনন্দ হয় আর ছেলেবেলার কত কথাই মনে জেগে ওঠে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমাদের ছোটবেলার কলকাতায় বিজলী আলো ছিল না, ছিল গ্যাসের আলো, আর তেলের বাতি। বিজলী-পাখার বদলে হাত-পাখা আর টানা-পাখা। কাপড়ের কিম্বা মাদুরের ঝালরওয়ালা লম্বা লম্বা কাঠের ডাণ্ডা কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো থাকত, দড়ি দিয়ে টানতে হ'ত বলে তাকে বলতো "টানা-পাখা"। ঘরের মধ্যে লোকে আরামে কাজকর্ম করত, বিশ্রাম করত কিম্বা ঘুমোত, আর পাখা-কুলী বাইরে বসে দড়ি ধরে একবার টানত একবার ঢিল দিত। দড়ির টানে পাখা দুলত, তাতেই বাতাস হ'ত। একরকম পাখাটানার কল দেখেছিলাম, তাতে একটা ডাণ্ডার সঙ্গে পাখার দড়িটা আটকান থাকত। ডাণ্ডাটা খট্ খট্ করে সামনে-পিছনে নড়ত, আর দড়ির টানে পাখাও দুলত। আমাদের স্কুলে একজন পাখা-কুলী ছিল যেন জীবন্ত পাখা-কল। পায়ের সঙ্গে দড়িটা বেঁধে সে দিব্য আরামে ঘুম দিত, নাক ডাকার তালে তালে পা দুলত, পাখাও চলত। এত ঘুমের মধ্যেও কি করে যে তার পা চলত বুঝতেই পারতাম না।

তখনকার ট্রাম ছিল ঘোড়ায়-টানা। আবার খিদিরপুর ও আলিপুরের দিকে ট্রাম ছিল ইঞ্জিনে টানা। যতটা ধোঁয়া ছাড়ত আর শব্দ করত ততটা জোরে চলত না। তবু ঘোড়ার ট্রামের তুলনায় মনে হত কতই না তাড়াতাড়ি চলেছি। অমন প্রকাণ্ড ভারি গাড়ি

টানতে টানতে বড় বড় ঘোড়াগুলিও ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তাই খানিক দূর অন্তর ঘোড়া বদল হ'ত. গরমের দিনে ঘোড়ার মাথায় টুপি দেওয়া হ'ত—অনেকটা সোলা-হ্যাটের মত টুপি। কিন্তু ঘাড়ের দিকে অনেকখানি লম্বা। টুপির দুই ধারে দুই ফুটো—তার মধ্যে দিয়ে কান দুটো বেরিয়ে থাকত।

কত রকমের ঘোড়া-গাড়ি তখন ছিল, আজকাল সে সব বড় আর দেখা যায় না। কাজকর্ম করবার আর আপিসে যাবার জন্য অফিস-যান বা পাল্কিগাড়ি, হাওয়া খাবার জন্য ল্যাণ্ডো, ব্যারুস ও ফিটন গাড়ি, ডাক্তারের রোগী দেখবার জন্য ব্রুহাম গাড়ি। মোটর ত তখন ছিলই না, রাস্তা দিয়ে সাইক্‌ল গেলেও আমরা ছুটে গিয়ে দেখতাম।

পাল্কির খুব চলন ছিল। মায়ের সঙ্গে এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াতে যেতে আমরা গাড়ির চেয়ে পাল্কিই বেশী চড়তাম। একবার একটা গলির মধ্যে বেয়ারারা পা পিছলিয়ে পাল্কিশুদ্ধ আমাদের নিয়ে পড়ে গিয়েছিল, সেই থেকে আমরা আর পাল্কি চড়তে চাইতাম না। দোলের সময় পাল্কি-বেয়ারারা বকশিশ চাইতে আসত গায়ে-মাথায় আবির মেখে, একটা ছোট লাঠিকে বাঁশির মত করে ঠোঁটের কাছে ধরে তারা বাঁকা হয়ে নাচত, আর গান গাইত—"কেড়ি ক-দ ম্ব মূড়ে—এ-এ-এ" (কেলি কদম্ব মূলে)।

তখন সিনেমা ছিল না, কিন্তু ভাল ভাল সার্কাস ছিল। শীতকালে গড়ের মাঠে প্রকাণ্ড সব তাঁবু পড়ত। একবার আমাদের বাড়ির পাশে বড় মাঠটায় একটা সার্কাস এল। প্রথমে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাড়ি করে মালপত্তর এল, দেখতে দেখতে মাঠটা ঘিরে টিনের দেওয়াল উঠল, বড় বড় প্ল্যাকার্ডে লেখা হল "দি গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস"। প্রকাণ্ড তাঁবু উঠল, বাঁদর, কুকুর, ঘোড়া, খাঁচার মধ্যে বাঘ সবই এল। আমাদের কি মজা! সার্কাস তো খুবই দেখলাম, সার্কাসের লোকদের

জীবনযাত্রাও অনেকটা দেখতে পেলাম। পিছন দিকে ছোট ছোট তাঁবু ও চালাঘরের মধ্যে তারা থাকত। তাদের ঘরকন্না, খেলা প্র্যাক্‌টিস করা, জন্তুদের খাওয়ানো, পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এসব দেখতে খুব ভাল লাগত। খেলা দেখবার সময় জরি ও সাটিনের ঝলমলে পোশাক পরে, বুকে সারি সারি মেডল ঝুলিয়ে, তাঁবুর ভিতরের উজ্জ্বল আলোতে তাদের চেহারা কী জমকালো দেখাত, আর বাইরে দিনের আলোয় সাধারণ পোশাকে তাদের যেন আর চেনাই যেত না। এই সার্কাসে প্রসিদ্ধ বাঙালী পালোয়ান শ্যামাকান্তবাবু বাঘের সঙ্গে কুস্তি দেখাতেন, বুকের উপর প্রকাণ্ড পাথর রেখে

··এই সার্কাসে
প্রসিদ্ধ বাঙালী পালোয়ান,
শ্যামাকান্তবাবু
বাঘের সঙ্গে
কুস্তি
দেখাতেন···
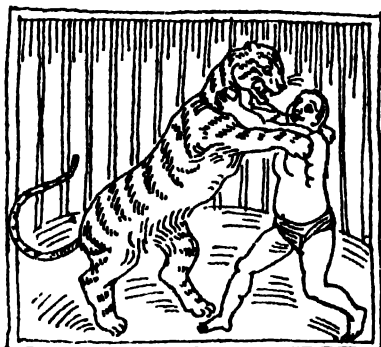
ভাঙতেন, আরো কত গায়ের জোরের খেলা দেখাতেন। মাসখানেক পরে সার্কাসওয়ালারা পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে আবার কোথায় চলে গেল।

সুন্দর সুন্দর পুতুলনাচ ছিল—রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, যুদ্ধ, সং ইত্যাদি দেখাত। একটা বিলাতী কোম্পানীর পুতুল নাচ দেখেছিলাম, সেরকম সুন্দর আর দেখিনি। বিশেষ করে সমুদ্রের তলার একটা দৃশ্য আজো মনে পড়ে। গভীর জলের মধ্যে প্রবাল, স্পঞ্জ ও শ্যাওলার জঙ্গল, তার ভিতরে কত শামুক, ঝিনুক ও কাঁকড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কত নানা রঙের মাছ। একটা

রাক্ষুসে মাছ হাঁ করে তাদের গিলতে এল—ভয়ে তারা চারিদিকে ছিটকে পড়ল। জলে ডুবুরী নামল, হাঙ্গরের সঙ্গে, অক্টোপাসের সঙ্গে তার লড়াই হ'ল। অক্টোপাশ পা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরছে, কুড়ুল দিয়ে সে পা কেটে দিচ্ছে, আর রক্তে নীল জল লাল হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য সে দৃশ্য!

প্রথম যে সিনেমা দেখেছিলাম তাতে গল্প কিছু ছিল না শুধু চলন্ত ছবি। সমুদ্রে ঢেউ উঠছে, জাহাজ দুলতে দুলতে চলেছে। হঠাৎ ঝড় উঠল, পাহাড়ের মত উঁচু হ'য়ে ঢেউ ফুলে উঠল, জাহাজ বুঝি ডুবল। আবার আস্তে আস্তে সব শান্ত হয়ে গেল। কিংবা স্টেশনে ট্রেন এল, লোকেরা ছুটোছুটি করে উঠল-নামল, কুলীরা মালপত্তর তুলল-নামাল, আবার ধোঁয়া ছেড়ে ট্রেন চলে গেল, প্ল্যাটফর্ম খালি। মজার ছবিও থাকত—একজন লোক বিজ্ঞাপন দেখে টাকের ওষুধ কিনে এনে নিজের টাকে লাগাল—দেখতে দেখতে সুন্দর ঘন চুলে টাক ঢেকে গেল। লোকটি তো মহাখুশী। ওমা! খানিক পরে দেখে কি, হাতে মুখে কাপড়ে টেবিলে, যেখানেই একটু ওষুধ লেগেছে সেখানেই ভুস্‌ভুস্‌ করে চাপড়া চাপড়া চুল গজিয়ে উঠছে। আরেকজন লোক রাস্তায় যেতে যেতে স্টীম রোলার চাপা পড়ে একেবারে কাগজের মত পাত্‌লা চ্যাপ্টা হয়ে গেল। খানিক পরে দুটি লোক সাইকেলে চড়ে যেতে যেতে দেখল, রাস্তায় একটা কাগজের মত মানুষ পড়ে আছে। তারা সেটাকে তুলে নেড়েচেড়ে দেখল, ফিস্‌ফিস্‌ করে কি পরামর্শ করল, তারপর তার নাকেমুখে সাইকেলের পাম্প দিয়ে পাম্প করতে করতে বেলুনের মত করে ফুলিয়ে তাকে আবার দিব্য গোলগাল মানুষ বানিয়ে দিল। কয়েক বৎসর পরে, গড়ের মাঠে প্রকাণ্ড তাঁবুর মধ্যে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ বায়োস্কেপ (Elphinstone Bioscope) খুলল তারপর থেকে ক্রমে ভাল ভাল ছবি দেখতে পেলাম।

এরোপ্লেন তো তখন ছিল না বেলুনের কথাই শুনতাম। খুব ছোট্টবেলায় কবে একবার গড়ের মাঠে বেলুন উড়েছিল সেটার কথা কিছু মনে নেই কিন্তু তারপর অনেকদিন ধরে আমরা ছড়া কাটতাম—"উড়লো বেলুন গড়ের মাঠে, পড়লো বেলুন বসিরহাটে"। তারপর একদিন দুপুরবেলায় "বেলুন!" "বেলুন!" চিৎকার শুনে আমরা ছাতে গিয়ে দেখলাম একটা বেলুন উড়ে যাচ্ছে। বাবার দূরবীন দিয়ে দেখা গেল গোল বেলুনের নীচে বড় একটা বাস্কেটের মত জিনিস ঝোলানো, তার মধ্যে একজন সাহেব বসে গোছা গোছা
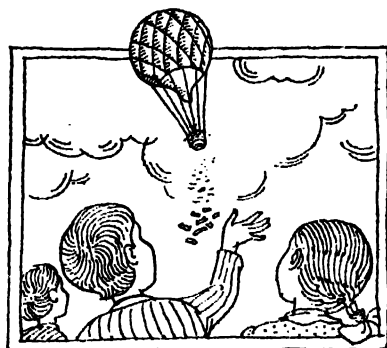
কাগজের মত কি জিনিস ফেলছে। ঐসব কাগজে সাহেবের বেলুন উড়বার বিজ্ঞাপন ছিল।

ছোটদের জন্য প্রথম বাংলা পত্রিকা ছিল "সখা ও সাথী"—প্রথমে দুটো আলাদা কাগজ ছিল, "সখা" আর "সাথী" নামে, অল্পদিন পরে দুটোকে এক করে হ'ল "সখা ও সাথী"। "সখা ও সাথী" এলেই দাদারা খুব আগ্রহ করে পড়ত, আমি তখনও পড়তে শিখিনি। ওরা পড়ত, আমি শুনতাম। তারপর এল "মুকুল"। ততদিনে আমিও পড়তে শিখেছি। তখন আমাদের দেশে ভাল ছাপা আর ছবি হ'ত না কিন্তু মুকুলের লেখা খুব সুন্দর ছিল—কত ভাল ভাল গল্প ও কবিতা, সহজ

বিজ্ঞানের কথা, ভ্রমণ কাহিনী, জীবন চরিত, ধাঁধা ইত্যাদি থাকত। ছোটদের উপযুক্ত ছবিওয়ালা বইও ক্রমে বেরল। ঠাকুরমাকে সুর করে রামায়ণ পড়তে শুনেছিলাম, বাবার কাছে রামায়ণ মহাভারতের কত গল্প শুনেছিলাম। এবার গল্পের মতই সহজ সুন্দর ভাষায় তাঁর "ছেলেদের রামায়ণ", "ছেলেদের মহাভারত" পেলাম আর পেলাম যোগীন্দ্র সরকারের নানা গল্প ও ছড়ার বই। এই সব হ'ল ছোটদের জন্য বাংলার প্রথম ভাল বই।

এখন সকলে কাঁচের নলের মধ্যে রাখা বীজ থেকে বসন্তের টিকা নেয়, আমরা ছোটবেলায় টিকা নিয়েছিলাম নির্ভেজাল "গো-বীজ" বসন্ত থেকে। রোগওয়ালা একটা বাছুরকে কোলে করে এনে তার গায়ের গুটি থেকে পুঁজ নিয়ে টিকা দিয়ে দিত।

আমাদের ছোটবেলায় কলকাতা শহরটা অনেক ছোট ছিল। এখন যেখানে চওড়া নতুন রাস্তার দুধারে বড় বড় বাড়ি হয়েছে তার অনেকখানি ঝোপ জঙ্গল ডোবায় ভরা পাড়াগাঁয়ের মত ছিল। কিন্তু সে কলকাতার মান ছিল কত! সে ছিল তখন ভারতবর্ষের রাজধানী। "রাজভবন", এখন যেখানে বাংলার গভর্নর থাকেন, সেখানে থাকতেন ভারতের গভর্নর জেনারেল (বড়লাট), আর আলিপুরের "বেল্‌ভিডিয়ার", এখন যেখানে "ন্যাশনাল লাইব্রেরী" আছে, সেখানে থাকতেন বাংলার গভর্নর—ছোটলাট। ভারত গভর্নমেণ্টের কেন্দ্র এখন দিল্লীতে, তখন ছিল কলকাতায়, সুতরাং তার জাঁকজমক আর গৌরব ছিল খুব।
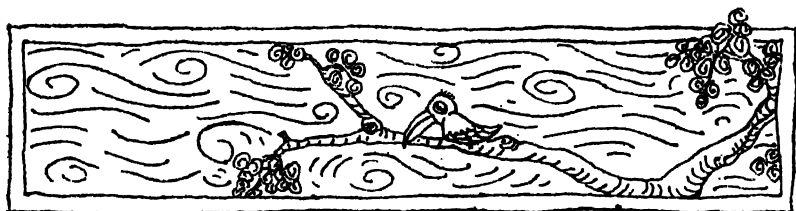
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমরা ছিলাম শহরবাসী। কলকাতায় জন্ম, কলকাতাতেই বাস। প্রতি বৎসর ছুটির সময় বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যেতাম পাহাড়ে, পশ্চিমে, কিম্বা আমাদের 'দেশে'। ট্রেনে, স্টিমারে, নৌকায়, অবশেষে হাতি এবং পাল্কিতে চড়ে পূর্ব-বাংলায় আমাদের সেই গ্রামে যাওয়াটা আমাদের কাছে যেন মস্ত একটা এডভেঞ্চার ছিল।

রাত্রে শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনে চড়ে সকাল বেলায় গোয়ালন্দে স্টিমার ধরতাম। মস্ত মস্ত জাহাজ, তাদের নাম ছিল এলিগেটর, ক্রোকোডাইল, পরপয়জ; আবার একদল ছিল ঈগ্‌ল্, কণ্ডর, ভালচার। আমরা কেবিনের ভিতরে থাকতেই চাইতাম না, সারাদিন ডেকে দাঁড়িয়ে দুধারের দৃশ্য দেখতাম। একেক জায়গায় নদী এত চওড়া যে, এপার থেকে ওপার ভাল করে দেখাই যায় না। বর্ষাকালে পদ্মা নদীর স্রোতের এত জোর হয় যে, অনেক সময় দুই তীর ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কত ক্ষেত-গ্রাম ঘরবাড়ি, পুরনো দিনের কত কীর্তিচিহ্ন যে পদ্মা নাশ করেছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই। সেজন্যে তার আরেকটা নাম "কীর্তিনাশা"। এক জায়গায় মা দেখাতেন এইখানে তাঁর মামাবাড়ি ছিল—পদ্মার ভাঙ্গনে গ্রামসুদ্ধ কোথায় তলিয়ে গিয়েছে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে অনেক দিনের পুরনো মস্ত উঁচু "রাজবাড়ির মঠ," বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদরায় ও কেদাররায় তাঁদের

মায়ের শ্মশানের উপরে এই মঠ তুলেছিলেন। এই দুই বীর ভায়ের নাম বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত। সম্রাট আকবরের সৈন্য যখন বাংলা দেশ জয় করতে এসেছিল, তখন বাংলার বারো জন প্রতাপশালী জমিদার (বারো ভুঁইয়া) বাংলা দেশ রক্ষা করবার জন্যে সেই প্রবল মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। চাঁদরায় ও কেদার-রায় সেই বারো ভুঁইয়ার মধ্যে দুজন। কয়েক বৎসর পর কাগজে পড়েছিলাম যে, সে অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সেই মঠটাকেও পদ্মা গ্রাস করেছে।
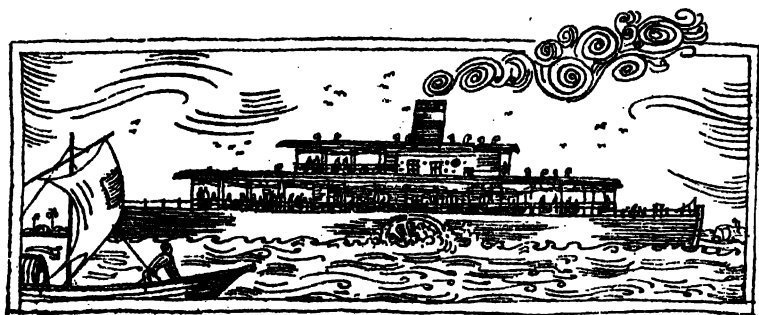
…মস্ত মস্ত জাহাজ, তাদের নাম ছিল…

বিকালের দিকে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে ট্রেনে উঠতাম। রাতদুপুরে কাওরাইদ স্টেশনে নেমে নৌকায় চড়তে হত। কাছাকাছি গভীর জঙ্গল, স্টেশন থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তায় শুনতাম নাকি 'ভয় আছে'। আলো নিয়ে, লম্বা লম্বা লাঠি হাতে, অনেক লোকজন সঙ্গে থাকত—ঘুমচোখে গিয়ে আবার নৌকোর মধ্যে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়তাম।

সকালে উঠে দেখতাম এবার পদ্মা নয়, অনেক ছোট নদী দিয়ে চলেছি। বেলা হলে এক জায়গায় নৌকো বেঁধে সঙ্গের লোকজন রান্না করত, আমরা নৌকোর আড়ালে নদীতে নেমে স্নান করতাম।

নদীর ঢালু পাড়ে মাটির মধ্যে ছোট ছোট গোল গোল গর্ত, তার মুখের কাছে অনেক মাছের কাঁটা বসানো—শুনলাম ওগুলো নাকি মাছরাঙা পাখির বাসা। ইঁদুর প্রভৃতি যাতে ঢুকতে না পারে, তাই মাছরাঙা পাখি মাছ খেয়ে তার কাঁটাগুলো দিয়ে গর্তের মুখে 'কাঁটা তারের বেড়া' বানিয়ে দেয়। লম্বা ঠোঁটওয়ালা সুন্দর নীল মাছরাঙা পাখিকেও দেখলাম, জলের ধারে গাছের ডালে চুপ করে বসে আছে—মাছ দেখতে পেলেই তীরের মত ছোঁ মারছে।

স্নান করে, খেয়ে দেয়ে, আবার তুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে যেতাম, সারাদিন খেলা, গল্প ইত্যাদি হত। একবার আমরা নৌকোর মধ্যে বসে গল্প করছি, সুষমা দিদি জানালার উপরে চড়ে বসেছে। জানালাটা যে ভাল করে আটকানো ছিল না তা সে দেখেনি ; যতই সে জানালায় ঠেস্ দিচ্ছে, ততই জানালা ফাঁক হচ্ছে। হঠাৎ আমরা চেয়ে দেখি, সুষমা দিদির মাথা আর হাত-পা'ই শুধু ভিতরে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা বাইরে ঝুলে পড়েছে। বড় বড় চোখ করে সে প্রাণপণে হাতে-পায়ে জানালা আঁকড়ে রয়েছে, কিন্তু টুঁ শব্দটি করছে না। আমরা চেঁচামেচি করাতে বড়রা কে যেন ছুটে এসে তাকে টেনে তুললেন, আরেকটু দেরি হলেই একেবারে ঝ-পা-ং!

নৌকো যখন গিয়ে ঘাটে লাগত, তখনও বাড়ি অনেক দূর। ঘাটে হাতি, পাল্কি-ডুলী অপেক্ষা করত। একটা বড় হাতি ছিল, সে 'পাগলা' বলে তার পিঠে কেউ চড়ত না, মালপত্র সব তার পিঠে চাপানো হত। ছোট হাতীটা খুব শান্ত, বাবা-কাকারা তার পিঠে চড়তেন, আমরা ডুলী-পাল্কিতে ভাগাভাগি করে চড়তাম। মনে পড়ে, একবার মা টুনী মণিকে নিয়ে পাল্কিতে চড়লেন, সুরমা মাসী আর দিদি উঠল একটা সুন্দর চূড়োওয়ালা "মহাপায়া"তে (চতুর্দোলার মত), দাদার আর আমার ভাগ্যে জুটল একটা বাঁশের ডুলী। আমি কেঁদে-

কেটে জোর করে দিদি আর সুরমা মাসীর মাঝখানে ঠেসে দোলায় চেপে বসলাম, দাদা লক্ষ্মী ছেলের মত একাই ডুলীতে গেল। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হত, কারা যেন শাঁখ বাজাত, ঠাকুরমা, পিসীমারা এগিয়ে এসে আমাদের আদর করে ঘরে নিয়ে যেতেন।

দেশের ঘরবাড়ি, বাগান, পুকুর, আমাদের কাছে সে এক নতুন রাজ্য। বাগানে অজস্র ফুল, কোঁচড় ভরে তুলে আনতে কত আনন্দ। গাছের পাকা ফল নিজের হাতে পেড়ে নিতে কী মজা। শ্বেতপাথরের খেলনার মত সুন্দর চিনির তৈরী হাতি-ঘোড়া, রথ, গ্রামের কুমোরের হাতে-গড়া লাল পোড়ামাটির খেলনা; টানা টানা চোখ আর টিকলো নাকওয়ালা, নাকে কানে গয়না পরবার ফুটোওয়ালা, মাটির নানারকম পুতুল; কী চমৎকারই লাগত! সবচেয়ে চমৎকার লাগত ঠাকুরমা-পিসীমাদের হাতের তৈরী নানারকম ক্ষীরনারকেলের মিষ্টি। সেইসব ক্ষীরের লাড়ু, তিলের লাড়ু, তক্তি, ক্ষীরের ছাঁচ, পাটিসাপ্টা, গোকুল পিঠে, মুগপুলি, চন্দ্রপুলি, গঙ্গাজলির কথা কোনদিন ভুলিনি। ঠাকুরমা পিসীমা যখন কলকাতায় আসতেন, তখনও আমাদের চোখ থাকত তাঁদের সঙ্গের বড় বড় হাঁড়িগুলোর উপরে। মুখে সরা-চাপা, ময়দা দিয়ে আঁটা সেই সব মাটির হাঁড়িতে নানারকম মিষ্টি ভরা থাকত।

বাড়ির গরুর দুধ-সর, পুকুরের মাছ, গাছের আম-কাঁঠাল, বাগানের ফল-তরকারি, ঘরে তৈরী পিঠে-পুলি, পাড়াগাঁয়ের এইসব সুখাদ্যের চেয়ে টুকিটাকির উপরেও আমাদের লোভ কিছু কম ছিল না। সেসব বানাতেও আমাদের পাড়াগাঁয়ের পিসী-দিদিরা বেশ ওস্তাদ ছিল। গাছ থেকে কাঁচা আম কিংবা বরই (কুল) পেড়ে তেল-নুন-লঙ্কা দিয়ে এমন চাটনী বানাত যে ঝালের চোটে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেলেও হুস্‌হাস্ করে খেয়ে নিতাম। বেতগোটা (বেত গাছের ফল) পেড়ে, তেল-নুন মেখে, পাথরবাটিতে করে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলত, "আম

পাকে, জাম পাকে, মামা-বাড়ির বেথুন পাকে।" নাড়তে নাড়তে সেগুলো নরম হয়ে যেত, তখন খেতে সুন্দর সুস্বাদু লাগত।

আমাদের চোখে গ্রামের এসব যেমন নতুন, গ্রামের লোকদের চোখে আমরাও তেমনি নতুন। আমাদের সাজ-পোশাক, চাল-চলন, "কল্‌কাত্তিয়া" কথাবার্তা সবই তারা অবাক হয়ে লক্ষ্য করত। কলকাতা শহরের গল্প শুনবার জন্য, শহর থেকে আনা কতরকম নতুন জিনিস দেখবার জন্য পাড়াপড়শিরা ভিড় করে আসত। আমরা যখন তালে তালে নেচে নেচে কলকাতার স্কুলে শেখা খেলার গান গাইতাম, পাড়ার মেয়েরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলত "আহা! ঠিক যেন ইন্দ্রপুরী!"

দেশের ঘরবাড়ি ছিল অন্য রকমের। মাঝখানে শুধু একটা দোতালা পাকাবাড়ি ও পূজার দালান, আর সব বড় বড় উঁচু উঁচু টিনের কিংবা "ছনের" ছাওয়া ঘর। কলকাতার মত ঘেঁষাঘেঁষি নয়, অনেকখানি জায়গা জুড়ে কতগুলি আঙ্গিনা ঘিরে ফাঁকা ফাঁকা আলাদা আলাদা ঘর। এঘর থেকে ওঘর যেতে আমাদের মনে হ'ত যেন এবাড়ি থেকে ওবাড়ি যাচ্ছি।

একদিন একটা ঘরের পিছন দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্যে থেকে তিনচার হাত লম্বা একটা কুমীর বেরিয়ে এল। আমরা তো "কুমীর" "কুমীর" চিৎকার করে পড়ি কি মরি হয়ে ছুটলাম। সুন্দরকাকা বেরিয়ে এসে "আরে, ওটা কুমীর নয়—গোসাপ" বলে একটা ঢিল ছুঁড়ে সেটাকে তাড়িয়ে দিলেন।

আরেকদিন আমি পিসীমার সঙ্গে পাড়া-বেড়িয়ে ফিরছি, আমাকে ঘাটের সিঁড়ির মাথায় দাঁড় করিয়ে পিসীমা পুকুরে পা ধুতে নামলেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, গাছপালার মধ্যে জমাট অন্ধকার। আমার কেমন গা ছম্‌ছম্ করছে। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কি একটা নড়ে উঠল আর হেঁড়েগলায় বলল, "ভুতুম! ভূত—ভুত—ভুতুম!" আমি তো

চিৎকার করে উঠলাম, "ও পিসীমা, শিগ্গীর এসো!" পিসীমা দৌড়ে এসে আমাকে কোলে নিয়ে বললেন, "দুর বোকা মেয়ে। ভূত নয় ওটা পাখি। হুতোম পেঁচা জানিস না?"

আমরা সাঁতার জানতাম না তাই পুকুরে স্নান করতাম না। একদিন ছোটপিসী চুপি চুপি সুরমা-মাসীকে বলল, "পুকুরে স্নান করতে যাবি?"

সুরমা-মাসী ভয়ে ভয়ে বলল, "যদি ডুবে যাই।"

"ভয় কি? আমি তো রয়েছি!"

"দিদি যে মানা করেছেন?"

"দিদি টের পেলে তো? এখন কেউ নেই ওদিকে।"

এমনি করে মাসীরই সমবয়সী পিসী ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল। চারদিক ঘেরা একেবারে নির্জন খিড়্কিপুকুর, ওরা চুপি-চুপি স্নান করতে নামল, কেউ টের পেল না। আমাদের একজন দাদা ছিলেন, তাঁর পরীক্ষা সামনে। নিরিবিলি বসে পড়বার জন্য তিনি উপরে গেলেন; দোতলায় দুপুরবেলায় কেউ থাকত না। পিছন দিকের জানালা খুলতেই তিনি দেখতে পেলেন পুকুরে জলের মধ্যে কি যেন একটা ঢেউ কেটে লাফিয়ে উঠল! মাছ মনে করে তিনি সেই দিকে তাকিয়ে আছেন, খানিক পরেই আবার সেই জিনিসটা উঠেই ডুবে গেল। তখন দেখতে পেলেন মাছ নয়—ছোট একখানি হাত। তখনি ছুটে গিয়ে তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সাঁতার কেটে সেই জায়গাটায় গিয়ে জলের নীচে হাতড়িয়ে ওদের তুললেন। দুজনে জড়াজড়ি করে জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছিল, আরেকটু দেরী হলেই আর রক্ষা ছিল না।

আরেকদিন দুপুরবেলায় দিদি দাদা আর আমি বাইরের পুকুরের নির্জন বাঁধা-ঘাটে বসে আছি, হঠাৎ কোথা থেকে প্রকাণ্ড লম্বা একটা

লোক এসে হাজির। তার দুই হাত রক্তমাখা, হাতের লম্বা ছুরিটা থেকে টপ্-টপ্ করে রক্ত ঝরছে। দিদি আর আমি তো ভয়েই অস্থির, দাদা কিন্তু আমাদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে লোকটার পথ আগলে দাঁড়াল। পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে, লোকটা আমাদেরই বাড়িতে পাঁঠা কেটে পুকুরে হাত ধুতে এসেছিল, কিন্তু তখন তো আমরা তাকে ভীষণ দস্যু-ডাকাত ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি। দাদার বয়স তখন ছয় বৎসরের বেশী হবে না, ছোট্ট দাদার সাহস দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম।

একদিন রাত্রে একটা বিকট গর্জন শুনে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। মা বললেন, ওটা হাতির ডাক। অনেক দূরে, সুসঙ্গের পাহাড়ের জঙ্গলে হাতি ধরে এখানে পবনখালির বাজারে বিক্রী করতে আনে, সেই হাতি ডাকছে। একদিন একটা ছানা-হাতিকে বিক্রী করবার আশায় আমাদের বাড়িতে নিয়ে এল। দিব্যি মোটাসোটা বাচ্চা, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তার গায়ে কি জোর! সঙ্গের লোকেরা কিছুতেই তাকে ভিতরে আনতে পারল না, শেষে দুটো হাতি তাকে টেনে নিয়ে এল। এসেই সে রাগে ফোঁস্ফোঁস্ করতে লাগল আর শুঁড়ে করে উঠোনের ধুলো তুলে সকলের গায়ে ছিটিয়ে দিল। ঐটুকু বাচ্চার রাগ দেখে সকলেই হাসতে লাগল।

আমাদের যে দুটো হাতি ছিল তাদের নাম "যাত্রামঙ্গল" আর "কুসুমকলি"। নাম শুনেই বোধ হয় বুঝতে পারছ যাত্রামঙ্গল ছেলে আর কুসুমকলি মেয়ে। কুসুমকলি খুব শান্ত, মাহুত গুপীদাদা তাকে বাড়ির ভিতরের আঙ্গিনায় এনে বলত, "মা-ঠাকরুণদের প্রণাম কর্।" সে একে একে ঠাকুরমা, পিসীমা, জ্যেঠিমা, মা, খুড়িমা সবাইকে প্রণাম করত—আস্তে আস্তে শুঁড়টি বাড়িয়ে দিয়ে পায়ে বুলোত, তারপর শুঁড় গুটিয়ে নিয়ে নিজের কপালে ঠেকাত। মাহুতের কথামত সে

শুয়ে পড়ত, দাঁড়াত, দুই পা মুড়ে বসত, চার পা মুড়ে বসত, মাহুতকে শুঁড়ে করে দোলাত, জড়িয়ে পিঠে তুলে নিত।

যাত্রামঙ্গল খুব বড় আর সুন্দর, কিন্তু সে নাকি একবার পাগল হয়ে গিয়েছিল। এখনও মাঝে মাঝে তার মাথা গরম হয়। মাথা গরম হলে তার পিঠে কেউ চড়ত না। একদিন মাহুত যাত্রাকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে। সামনে একজন বুড়ি একটা পুঁটলী মাথায় নিয়ে চলছিল, হাতি আড়চোখে পুঁটলীটার দিকে তাকাচ্ছে দেখেই মাহুত বলল, "ও বুড়ি, পালা।" বুড়ো মানুষ, সে কি ছুটতে পারে? যতই

...একজন বুড়ি পুঁটলী মাথায় নিয়ে চলছিল...মাহুত বলল, "ও বুড়ি, পালা।"...

সে ছোটে হাতিও তত লম্বা লম্বা পা চালায়। ভাগ্যিস্ সামনে একটা খাল ছিল, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে ডুবসাঁতার কেটে পালিয়ে বাঁচল। পুঁটলীটা ফেলেই পালিয়েছিল, হাতি এসে দাঁত দিয়ে সেটাকে কুটিকুটি করে ফেলল। এরপরে যাত্রার সেই লম্বা লম্বা দাঁত দুটো করাত দিয়ে কেটে ভোঁতা করে দেওয়া হল। দাঁত কাটতে তো ব্যথা লাগে না, তবে সারা গা নাকি শির্‌শির্ করে। যাত্রার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লেগেছিল। এরপর থেকে যে লোকটি শাঁখের করাত দিয়ে তার দাঁত কেটেছিল দূর থেকে তাকে দেখলেই যাত্রা ভীষণ ক্ষেপে উঠত।

পাগলাহাতি বাঁধা রয়েছে, এক বুড়ি তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, মাহুত ডেকে বলল, "ও বুড়ি, ওদিকে যাস না, হাতি কিন্তু পাগলা।" বুড়ি একগাল হেসে বলল, "না-গে্গা, যাত্রা আমারে কিস্সু কয় না।" একটু বাহাত্বরী দেখাবার জন্য একেবারে কাছে এগিয়ে সে হাতির শুঁড়ে হাত বুলোতে গেল। যেই না হাত তুলেছে অমনি যাত্রা তার ঐ ভোঁতা দাঁত ত্নটো বুড়ির ত্নই বগলে দিয়ে মারল এক গুঁতো। বুড়ি একেবারে শূন্যে ডিগ্‌বাজি খেয়ে সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ল! জল দিয়ে, বাতাস করে, সবাই তো বুড়িকে সুস্থ করে তুলল কিন্তু এরপর থেকে তাকে দেখলেই লোকে ক্ষেপাত—"কি-গে্গা, যাত্রা তোমারে কিস্সু কয় না!"

যাত্রা মাঝে মাঝে শিকল ছিঁড়ে পালাত, তখন হুলুস্থূল পড়ে যেত। একদল লোক তাকে ধরতে ছুটত। লোকজন আসছে দেখলেই সে আড়ালে গিয়ে লুকাত কিন্তু ছেঁড়া শিকলের ঝন্‌ঝনানিতে লোকে বুঝে ফেলত সে কোন দিকে যাচ্ছে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় কেউ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না, শিক্‌লের শব্দও পাচ্ছে না। খুঁজতে খুঁজতে দেখে একটা উঁচু ঘরের পিছনে যাত্রা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ছেঁড়া শিকলের ডগাটা সাবধানে শুঁড় দিয়ে তুলে ধরেছে যাতে শব্দ না হয়। সেও বেশ বুঝে নিয়েছে যে, এই শিকলটাই যত নষ্টের গোড়া।

মাথা ঠাণ্ডা রাখবার জন্য যাত্রাকে খুব দই খাওয়ান হত। এক গামলা দইচিঁড়ে সামনে ধরে দিলেই সে আর সব ভুলে একমনে সপাৎ সপাৎ করে খেত আর সেই ফাঁকে মাহুত যা করবার করে নিত। ত্নটো হাতিতে মিলে সারাদিন কত যে খেত, দেখে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। কচি ডালপাতা, কলাগাছ, কাঁঠাল, কলা, বেল, দইচিঁড়ে, খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। সেই জন্যই তো কেউ যদি ভীষণ রকম খায়, তবে

লোকে বলে "বাবা! যেন হাতির খোরাক্!" তা' হাতি বেচারার দোষ কি? ওর অত বড় শরীরে অতখানি শক্তি রাখতে হবে তো?

আবার একদিন হাতি-পাল্কি চড়ে ঘাটে এসে নৌকায় চড়ে বসতাম বাড়ি ফিরবার জন্য। ফিরবার পথে গোয়ালন্দে বড় বড় তরমুজ কেনা হত। পদ্মার চরে চমৎকার তরমুজ হয়। একবার একজন কুলীর মাথায় প্রকাণ্ড একটা তরমুজ দেখে আমরা বলে উঠলাম, "ঈস্! কত বড়!" সে হেসে বলল, "একঠো আউর ভি বড়া হ্যায়।" চেয়ে দেখলাম আরেকজন লোক একটা অতিকায় তরমুজ প্ল্যাটফর্মে গড়িয়ে গড়িয়ে আনছে। এত বড় তরমুজ আর কখনও দেখিনি।

বড় হয়ে আর দেশে যাইনি। পঞ্চাশ বছরে তার না জানি কত পরিবর্তন হয়েছে। সেই নদী-বিল-মাঠ, সবুজ ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, ঘন আমকাঁঠালের বাগান, সে সব হয়তো তেমনই আছে, কিন্তু সে ঠাকুরমা-পিসীমা'রা তো আর নেই। সেই সব দাদা-দিদিরাও সব কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, সেই সব ঘরবাড়ি এখনও আছে কিনা কে জানে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খুব ছোট্টবেলায় কত জায়গায় যাওয়া হয়েছিল মনে নেই, তবে পচম্বার কথা কিছু কিছু মনে পড়ে। আমার বয়স তখন সাড়ে চার বৎসর। ফাঁকা মাঠের মধ্যে বাড়ি ছিল, রাত্রে চৌকিদার হাঁক দিয়ে যেতো, "বা—বু—জাগল্ হো···?" একেকদিন রাত্রে খুব চেঁচামেচি শুনতাম, "ভালু!" "ভালু!" মহুয়া খেতে ভাল্লুক খুব ভালবাসে। সামনের মাঠের মধ্যে গাছে যখন মহুয়া পাকত, তখন তার লোভে ভাল্লুক এসে জুটত। লোকেরা মশাল নিয়ে ছুটত আর বিকট হল্লা করে, টিন বাজিয়ে ভাল্লুক তাড়াত। আমরা ভয়ে লেপের মধ্যে আরও ঘেঁষাঘেঁষি করে শুতাম।

সকালে বেড়াতে গিয়ে কত সময়ে দেখতাম ছোট ছোট ঝোপগাছে কুল পেকে লাল হয়ে রয়েছে, তুলতে গেলেই সঙ্গের চাকর লছমন বলত, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোল, খবরদার বসবে না—তাহলেই ভাল্লুক আসবে।" আমরা ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে কুল তুলতাম। তখন তো বুঝতাম না ওসব লছমনের চালাকি। বসলে পাছে ধুলোমাটি লেগে আমাদের জামা-কাপড় নোংরা হয়, তাই মিথ্যা ওরকম ভয় দেখাত।

আমার একটা দোষ ছিল বাগানের গাছে ফুলের কুঁড়ি দেখলেই ছিঁড়ে নিতাম। একবার গাছে একটা লাউ হল। দাদা-দিদিরা বারবার আমাকে শাসিয়ে দিল যেন ওটা না ছিঁড়ি। আমি ঘুরেফিরে বারবার এসে দেখছি কচি লাউটা মাচায় ঝুলছে। তার গায়ে কেমন

পলকাটা নরম রোঁয়ায় ভরা। যত দেখছি ততই লোভ হচ্ছে কিন্তু নিতেও সাহস হচ্ছে না। শেষে দুপুরে যখন কেউ কোথাও নেই, তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না। পট্ করে সেটাকে নিয়েই দে-ছুট্। বিকালে খাবার সময়ে আমাকে কেউ খুঁজে পেল না, ডেকে ডেকে সাড়া পেল না, সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বেলা পড়ে এল, রোয়াকের উপর রোদে-দেওয়া বিছানাগুলো তুলতে গিয়ে ঝি দেখল কি, তার মধ্যে আমি ঘুমোচ্ছি! দোষ করে, ভয়ে লেপের মধ্যে লুকিয়েছিলাম, তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

বাড়ির সামনের মাঠে সাঁওতাল নাচ দেখতাম। গলায় মালাপরা, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা সাঁওতাল ছেলেরা মাদল বাজাত আর খোঁপায় ফুল-গোঁজা গয়নাপরা সাঁওতাল মেয়েরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে, কেমন সুন্দর নাচত। "বাঁশ-বাজি" দেখলাম একদিন। কতগুলি লোক লম্বা বাঁশ নিয়ে নানারকম ব্যালান্সের খেলা দেখাল। একজন লোক বাঁশটা হাতের তেলোর উপর খাড়া করে রাখল আর একজন ছোট্ট ছেলে তার ডগায় উঠে কতরকম ডিগ্‌বাজি খেল, চর্কিবাজির মত ঘুরপাক খেল। সবশেষে দুটো খুব উঁচু বাঁশ মাটিতে পুঁতে, মাথায় একটা দড়ি টান করে বেঁধে দিল। ছোট্ট ছেলেটা সেই বাঁশ বেয়ে উঠল। তার মাথায় একটা মস্ত হাঁড়ি উপুড় করে মুখটুখ সব ঢেকে দিয়েছে, সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। নীচে বসে তার বাবা বাজনা বাজাল, তার মা গান গাইল, আর তারই তালে তালে পা ফেলে, ছেলেটা ধীরে ধীরে দড়ির উপর দিয়ে পার হয়ে গেল। আমাদের ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি পড়ে যায়! কিন্তু চোখ ঢাকা অবস্থায়, শুধু একটা লাঠি হাতে নিয়ে ব্যালান্স করতে করতে কি সুন্দর চলে গেল।

খাকো-নদীতে, শ্লেট-নদীতে, তিলৌড়ি পাহাড়ে পিক্‌নিক্ হত।

গোরুর গাড়িতে কিংবা মানুষ-টানা পুশ্‌পুশ্‌ গাড়িতে চড়ে যেতাম। খিচুড়ি রান্না হত, পায়েস হত, গাছতলায় বসে খেতাম। টুনী ছোট্ট ছয়-সাত মাসের ছিল, তাকে বেতের দোলা-বাস্কেটে করে নিয়ে গিয়ে গাছে দোলা টাঙিয়ে দেওয়া হত। কত সুন্দর সুন্দর নানারঙের নুড়িপাথর, শ্লেট-নদী থেকে শ্লেটপাথর, মিছরির টুকরোর মত ধবধবে সাদা ও স্বচ্ছ চক্‌মকি পাথর কুড়িয়ে আনতাম। চকমকি পাথর

…একজন লোক
বাঁশটা
হাতের তেলোর উপর
খাড়া করে রাখল
আর
একজন ছোট্ট ছেলে
তার ডগায় উঠে
কত রকম
ডিগবাজি খেল,
চর্কিবাজির মত
ঘূরপাক খেল…

ঘষলে আগুনের ফুল্‌কি বেরোয়। কলকাতায় ফিরে আমরা সেই চওড়া বারান্দায় চকমকি পাথরের "রেস্‌" দিতাম। বারান্দার সিমেন্টের উপর ঘষ্‌টে ছেড়ে দিলে ঝিক্‌ঝিক্‌ করে আগুন বার করতে করতে যেত, সন্ধ্যার অন্ধকারে ভারি সুন্দর দেখাত। আমরা সারি সারি বসে পাথর ছেড়ে দেখতাম, কার পাথর সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যায়, আর সবচেয়ে বেশী আগুন বেরোয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চুণারের কথা খুব মনে পড়ে। একেবারে গঙ্গার উপরে সুন্দর মস্ত বাড়ি, ফুলবাগান, ফলবাগান, নদীর ধারে বসবার জন্য গোল লাল পাথরের বেদী, সুন্দর বাঁধানো ঘাট, কিন্তু আমাদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল বেদীর পিছনে মস্ত একটা বালির ঢিপি। সেখানে বালি খুঁড়ে ঘরবাড়ি পাহাড় বানাতাম, কত শামুক ঝিনুক বালির মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতাম।

রোজ গঙ্গায় স্নান করতাম। হয় কোলে চড়ে, নয়তো কারো হাত ধরে জলে নামতাম। সুরমা-মাসী একদিন জলে নেমে গামছাখানি নদীর জলের উপরেই রেখে দিল—যেমন কলকাতায় চৌবাচ্চার পাড়ে গামছা রাখত—খানিক পরে গামছা আর খুঁজে পায় না, ততক্ষণে ঢেউয়ে ঢেউয়ে কোথায় ভেসে গিয়েছে।

আমাদের বুড়ো চাকর গোবর্ধন একদিন গঙ্গার ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে দেখতে পেলো মস্ত বড় একটা মাছ একেবারে কিনারে এসে সক্ড়ি ভাতগুলো কপ্‌কপ্ করে খাচ্ছে। জলের ভিতরে মাছ কেমন করে নিঃশ্বাস নেয় জানো? তার মাথার দুই পাশে যে দুটো কান্‌কো আছে, সে দুটো একেকবার ফাঁক হয় আর কান্‌কোর ভিতরে চিরুণীর মত এক সেট ঝিল্লী আছে তার ভিতর দিয়ে জলটা ছেঁকে শুধু বাতাসটা ঢোকে। জলের নীচে মাছটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে, কান্‌কো দুটো একবার খুলছে একবার বুঁজছে, গোবর্ধন চুপ করে বসে তাই দেখছে।

হঠাৎ খপ্ করে ছুই কানকোর মধ্যে ছুই হাত ঢুকিয়ে সে মাছটাকে ধরে ফেলল। মাছটা প্রাণপণে পালাতে চাচ্ছে, গোবর্ধনও ছাড়বে না। শেষে যখন তাকে কোমর-জলে টেনে নিয়ে গেল, তখন সে ভয়ে চীৎকার আরম্ভ করল। ঠাকুর-চাকর সব ছুটে গিয়ে মাছটাকে টেনে ডাঙ্গায় তুলল। প্রকাণ্ড বড় মাছ, খুব ভোজ হ'ল। সবচেয়ে বেশী করে এবং প্রাণ ভরে খেলো গোবর্ধন।

সুন্দর একটা হরিণছানা পুযেছিলাম, তার বাদামী রঙ্গের গায়ে যেন চন্দনের ফোঁটা কাটা। এত ছোট ছিল যে, নিজে কিছুই খেতে

...মাছটা প্রাণপণে পালাতে চাচ্ছে, গোবর্ধনও ছাড়বে না...

পারত না। খুড়িমার ছোট্ট খোকা মায়ের ছুধ খেত, হরিণছানাও সেই সঙ্গে খোকার মায়ের ছুধ খেত। একটু বড় হয়ে আমাদের হাত থেকে কচি ঘাসপাতা খেতে আরম্ভ করল। আমাদের পিছন পিছন ছুটে যেত, কোলে নিয়ে আদর করতাম। হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল, সেটা মরে পড়ে আছে। বোধ হয় সাপে কামড়েছিল।

তারপর একদিন বাবা একটা কুকুরছানা নিয়ে এলেন। ভারি সুন্দর ঝাঁকড়া লোমওয়ালা ছোট্ট বাচ্চা, রাস্তার ছুষ্টু ছেলেরা ঢিল মেরে তার পা খোঁড়া করে দিয়েছে। মা তাকে সাবান দিয়ে স্নান

করিয়ে পায়ে পট্টি বেঁধে দিলেন, দুধ খাইয়ে একটা কাঠের বাক্সে খড় দিয়ে বিছানা করে দিলেন, যতদিনে তার পা সারল ততদিনে আমাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। তার নাম রাখলাম "ববী"। বাড়িওয়ালাদের দুটো বড় বড় কুকুর ছিল, তাদের নাম টবী আর বুলী; তারা যেমন বাড়ি পাহারা দিত তেমনি ববীকেও পাহারা দিত। অন্য কোনো কুকুর ববীর কাছে ঘেঁষতে পারত না। আমরা যেখানে যেতাম ববীও সঙ্গে যেত। যখন বালিতে খেলা করতাম, ববী পা দিয়ে বালি খুঁড়ে গর্ত করে একেবারে তার ভিতরে ঢুকে যেত, শুধু তার নাকটি আর

ববী পা দিয়ে বালি খুঁড়ছে

চোখ দুটি বেরিয়ে থাকত। তার গায়ের রং বালির সঙ্গে মিশে যেত, দেখাই যেত না। যেই "ব-বী—" বলে ডাক দিতাম, অমনি "ভৌঃ" বলে বেরিয়ে আসত।

বাগানের পাঁচিল ঘেঁষে কোন এক মুসলমান পীরের কবর ছিল, সূর্যাস্তের সময় দলে দলে লোক সেখানে নমাজ পড়তে আসত। সন্ধ্যার সময়, বাগানের আর এক কোনায় গ্রামের মেয়েরা অশ্বত্থতলায় বাস্তুসাপের পুজো দিতে আসত। বিরাট অশ্বত্থগাছটার কোটরে প্রকাণ্ড এক জোড়া কেউটে সাপ থাকত, মেয়েরা গাছতলায় প্রদীপ

দিয়ে সেই বাস্তুসাপের জন্য দুধকলা রেখে যেত। ভয়ানক সাপ আর কাঁকড়া বিছে ছিল সে-দেশে। আমাদের বাড়িতে একটা চমৎকার তুঁতগাছ ছিল, খুব বড় বড় আর ভারি মিষ্টি ফল হ'ত তাতে। আমরা রোজ তার তলায় যেতাম—কেউ গাছে চড়ে থোপা থোপা ফল পেড়ে দিত, আঁচল ভরে নিয়ে আসতাম। একদিন দেখা গেল, সেই গাছে পাঁচ-সাতটা বড় বড় সাপ কিল্‌বিল্‌ করছে। সেই থেকে আমরা আর সে গাছতলায় যেতাম না।

হুমায়ুন আর শের-সাহের গল্প তোমরা শুনেছ—শেরসাহ যখন হঠাৎ চুণার দুর্গ আক্রমণ করলেন, তখন হুমায়ুন দুর্গের মধ্যে গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলেন। তিনি সাঁতার জানতেন না। গল্প আছে, একজন ভিস্তি নাকি তার মশকের (জল নেবার চামড়ার থলি) উপর বসিয়ে তাঁকে গঙ্গা পার করে দেয়। পাহাড়ের উপর সেই দুর্গ, আর গঙ্গার ধারে যেখানে সেই সুড়ঙ্গের মুখ ছিল, দেখলাম। তখন কিন্তু সে সুড়ঙ্গ বুজে গিয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে আর যাওয়া যায় না।

দুর্গাকুণ্ড বলে একটা গরম জলের ঝরনা ছিল, তার ধারে একটা মন্দির, ভারি সুন্দর সে জায়গাটা। আমরা এ পাথর থেকে ও পাথরে লাফিয়ে ঝরনা পার হতাম, কুঁচ গাছ থেকে লাল-কালো কুঁচফল পাড়তাম, বন-করমচার গাছ থেকে বেগুনী রঙের ছোট ছোট পাকা করমচা তুলে খেতাম।

চুণারে নানারকম পাথরের জিনিস, মাটির পুতুল আর গালার চুড়ি ও খেলনা খুব সুন্দর পাওয়া যেত। ওখানকার পাহাড় কেটে বড় বড় পাথরের চাক্‌তি চালান যেত ঘরবাড়ি ব্রীজ ইত্যাদি তৈরী করার জন্য। একেকটা বড় পাথরে দেখতাম সুন্দর ঢেউকাটা দাগ—ঠিক যেন কেউ খোদাই করে রেখেছে। পাহাড়ের উপরে পাথরের গায়ে ঢেউয়ের দাগ কোথা থেকে এল? বাবা বললেন, লক্ষ লক্ষ বছর আগে এই সব

জায়গা জলের নিচে ছিল, তখন জলের নিচের বালিতে ঢেউয়ের দাগ পড়ত। কতকাল পরে সেই সব জমি ক্রমে আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে উঠল, জল সরে গেল, বালি জমে বেলে-পাথর হয়ে গেল, কিন্তু পাথরের বুকে সেই ঢেউয়ের দাগ চিরদিনের মত অক্ষয় হয়ে রইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চুণারে যেমন গঙ্গার উপরে ছিলাম, মধুপুরে তেমনি ছিলাম রেল-লাইনের উপরে। একেবারে বাড়ির পিছনের পাঁচিল ঘেঁষে ই. আই. আর. লাইন ছিল, যতক্ষণ বাড়িতে থাকতাম ঐ দিকেই মন পড়ে থাকত। ভিতরের চওড়া বারান্দায় সকালে যখন চা খাওয়া হ'ত, ঠিক সেই সময়ে পাশ দিয়ে হুস্ হুস্ করে মেইল ট্রেন চলে যেত। রোজ রোজ দেখে চেনা হয়ে গেলে গার্ডরা আগে থাকতেই হাসি-মুখ বাড়িয়ে থাকত, আমাদের দেখেই "গুড্ মর্নিং" বলত। আমরাও "গুড্ মর্নিং" বলে তাদের ইশারায় চায়ের টেবিলে খেতে ডাকতাম, তারাও ইশারায় বলত, "আসছি।" প্রতিদিন এটা একটা নিয়মিত খেলা ছিল।

একবার বাবা কি যেন কাজে কলকাতায় গেলেন, বাড়ির সামনে দিয়ে ট্রেন যাবার সময় বাবাকে দেখবার জন্য আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ট্রেন যখন এল, দাদারা "ঐ বাবা!" "ঐ যে বাবা!" বলে চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু আমি দেখতে পেলাম না—তাই কেঁদে ফেললাম। আসবার সময়ে আমাদের গাড়িটা সবুজ রঙের ছিল, তাই আমি হাঁ করে সবুজ গাড়িই খুঁজছিলাম, কিন্তু এবারে বাবার গাড়িটা ছিল সাদা। এই কথা শুনে বাবা আমাকে চিঠিতে লিখলেন—

রেলের যে সবুজ গাড়ি,
তাতে ছিল একটি বুড়ি—

জালার মত মোটা আর কয়লার মত কালো,
বসে ছিল সব ঢেকে, তাই তার ভিতর থেকে
বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না ভালো।
নেমে এলাম তাড়াতাড়ি
চড়লাম গিয়ে সাদা গাড়ি
তারপরে জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিলাম গলা—
যেই ঝাড়ির সামনে এলাম
তোমাদের দেখতে পেলাম,
কিন্তু আমি ভুলে গেলাম 'গুডমর্নিং' বলা!

আমরা প্রায়ই স্টেশনে বেড়াতে যেতাম। প্ল্যাটফর্মে বসে ট্রেন আসা-যাওয়া, লোকজনের ওঠা-নামা, দেখতে খুব ভাল লাগত। স্টেশনের কাছেই একটা বড় বাঁধ ছিল আমাদের বেড়াবার খুব প্রিয় জায়গা। তার তিন দিক ঘিরে উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে লাল রাস্তা ছিল, রাস্তার দুধারে লম্বা লম্বা 'সীতাহার' গাছের সারি। মিষ্টি গন্ধ-ওয়ালা সুন্দর সাদা সীতাহার ফুল ঘাসের উপর পড়ে থাকত, আমরা কুড়িয়ে এনে মালা গাঁথতাম। দুই দিকের দুই সিঁড়ি দিয়ে আমরা পাড়ের উপর ওঠা-নামা করতাম, বড়রা অনেক সময় ঢালু পাড় দিয়েই নামতেন। একদিন মনি বড়দের সঙ্গে নামবার জন্য আব্দার ধরল, সবাই বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ, পারবে না, পড়ে যাবে।" তবু সে জোর করে ওদের সঙ্গে চলল। একটু গিয়েই আর সামলাতে পারল না, গড়গড় করে গড়িয়ে পড়ল। আমরা তো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে আছি, সে কিন্তু দমবার পাত্র নয়—গড়াতে গড়াতেই বলছে, "দেখছো! কেমন কায়দা করে নামছি!" যা হোক, অতটা গড়িয়ে পড়েও দুয়েকটা আঁচড় ছাড়া আর কিছুই হয়নি—খুব ঘাস ছিল কিনা।

এ ছাড়া, মাঠে-ঘাটে, পাহাড়ে, শালবনে, ঝরনার ধারে বেড়ানো

তো ছিলই। একদিন মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটা ডোবা শুকিয়ে পাতলা কাদা হয়ে রয়েছে, তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ছোটকাকা হঠাৎ বসে পড়ে খুব মন দিয়ে কি দেখতে লাগলেন। আমরা কাছে যেতেই আমাদেরও ইশারা করে বসে পড়তে আর চুপ করে থাকতে বললেন, তারপর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—কাদার মধ্যে কালো কালো কয়েক জোড়া বিন্দু খুব আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাকা খুব সাবধানে একটা তুললেন, তখন দেখলাম একটা মাছ। কাদার মধ্যে তার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, শুধু চোখ দুটো এক জোড়া কালো বিন্দুর মত বোঝা যাচ্ছিল। একে একে যতগুলি দেখতে পেলেন সব তুলে কাছের একটা নালাতে কাকা ছেড়ে দিলেন। কাদার মধ্যে মাছগুলো বোধ হয় ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না, কেমন নির্জীব ভাবে অতি আস্তে আস্তে চলছিল। জলের মধ্যে পড়ে কি আনন্দে যে তারা সাঁতার কেটে বেড়াতে লাগল!

একদিন ছোটকাকার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে শালবনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় এলাম, তার চারদিকে বড় বড় পাথর ছড়ানো আর ঝোপঝাপ গাছ। লুকোচুরি খেলবার চমৎকার জায়গা। আমরা এমনি খেলায় মত্ত হয়ে গেলাম যে, কাকা বারবার ডাকছেন, "বেলা হ'ল, এবার বাড়ি চল," আমরা কিছুতেই শুনছি না, খালি বলছি, "না, না, আরেকটু পরে।" অনেকক্ষণ খেলে ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি যাবার মন হ'ল, তখন চারদিকে চেয়ে দেখি কাকা নেই। চিৎকার করে ডাকলাম, কোন সাড়া নেই। কী সর্বনাশ! কাকা রাগ করে আমাদের জঙ্গলে ফেলে চলে গেলেন নাকি? আমি আর টুনী-মনি তো কাঁদতে আরম্ভ করলাম। দাদা বলল, "বাড়ি চলো, আমি পথ চিনতে পারবো।" দিদি কিন্তু তাতে ভরসা পেল না। অনেকক্ষণ পরে খানিক দূরে শোনা গেল—"টু-উ"—আমরা ছুটে

সেই দিকে গেলাম, অমনি উল্টোদিক থেকে আবার শোনা গেল, "টু-উ"। এই ভাবে বেশ খানিক নাকাল করে তবে কাকা ধরা দিলেন। তারপর থেকে আর আমরা বেড়াতে গিয়ে দুষ্টুমি করতাম না।

আরেকজন দুষ্টু মেয়ের গল্প বলি। মেয়েটি ছিল আমাদের চেয়ে কিছু বড়, আমাদের সামনের বাড়িতে তারা থাকত। বড্ড জেদী আর অবাধ্য ছিল সে, তার মা'র কথা মোটেই শুনত না। তার কাকা একদিন তাকে খুব বকলেন। বকুনি খেয়ে সে রেগে কেঁদে বাড়ি থেকে চলে গেল। তার মা ভাবলেন, সে বুঝি রাগ করে পাড়ার কারো বাড়িতে গিয়ে বসে আছে, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন সে বাড়ি ফিরল না তখন তিনি ব্যস্ত হয়ে খোঁজ করতে আরম্ভ করলেন। পাড়ার লোকে দল বেঁধে খুঁজতে বেরল, দলের সর্দার হলেন কুঞ্জবাবু। বেজায় লম্বা বলে সবাই তাঁকে বলত—ঢ্যাঙ্গা-কুঞ্জ। একটা পড়ো-বাড়ির জানালা বেয়ে উঠে ভিতরে উঁকি মেরেই বিকট চিৎকার দিয়ে হাত-পা ছেড়ে ঢ্যাঙ্গাবাবু সকলের ঘাড়ে পড়লেন আর বলতে লাগলেন—"ভূত!" "ভূত!" ভূতও তত্‌ক্ষণে খচ্‌মচিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই দেখল, এক বেচারা সাদা গোরু, সেও কম ভয় পায়নি! সারারাত খোঁজ করেও কেউ মেয়েকে পেল না, তার মা তো কেঁদে অস্থির। কলকাতায় তার বাবাকে টেলিগ্রাম করা হ'ল, পুলিসে খবর দেওয়া হ'ল, যত পুকুর, কুয়ো সব খোঁজা হ'ল যদি অন্ধকারে পড়ে গিয়ে থাকে। পরদিন অনেক বেলায় দুজন সাঁওতাল তাকে বাড়ি পৌঁছে দিল, বলল—তাকে ওরা কুড়িয়ে পেয়েছে। মেয়ের যা চেহারা হয়েছে—হাঁটতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না। একটু সুস্থ হবার পরে সে বলল যে, রাগ করে কাঁদতে কাঁদতে সে যে ঝরনার ধার দিয়ে দিয়ে কত্তদুর চলে গিয়েছিল খেয়াল ছিল

না। হঠাৎ দেখল যে, সন্ধ্যা হয়েছে আর পথ হারিয়ে সে জঙ্গলে এসে পড়েছে। ঘুরে ঘুরে কোথাও পথ পেল না, তার উপরে বাঘের ডাক শুনে ভয়ে আধমরা হয়ে গেল। কোনোমতে একটা গাছে চড়ে সারারাত বসে কাটাল, ভোরবেলায় ঐ সাঁওতালরা কাঠ কাটতে জঙ্গলে এসে তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ি পোঁছে দিল! সে যে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে তাতেই বাড়ির লোকেরা যেন বাঁচলেন। পাড়ার কেউ কেউ তাকে খুব বকুনি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তার চেহারা দেখে আর কিছু বলতে মন সরলো

...হাত-পা ছেড়ে চ্যাঙ্গাবাবু সকলের ঘাড়ে পড়লেন ..."ভূত!" "ভূত!"...

না। ভাবলেন, "যাক্, বেচারার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।"

মধুপুরে আমাদের বাগানে চমৎকার গোলাপফুল হ'ত। ঐ অঞ্চলেই খুব ভাল ফুল হয়—কলকাতার অনেক বড় বড় ফুলের দোকানে ঐ অঞ্চলের ফুলবাগান থেকেই ফুল চালান আসে। আমরাও কলকাতায় ফিরবার সময় রাশি রাশি গোলাপফুল এনেছিলাম, আমাদের সঞ্চিত এক বোঝা নুড়ি-পাথর ও চক্‌মকি-পাথর এনেছিলাম, আর এনেছিলাম হাঁড়ি-ভর্তি ক্ষীরের প্যাঁড়া ও ঝুড়ি-ভর্তি ডিম। সেখানে খুব বড় বড় টাট্‌কা ডিম খুব সস্তায় পাওয়া যেত—গ্রামের

মেয়েরা ঝুড়ি বোঝাই করে বিক্রী করতে আনত। একবার তার মধ্যে থেকে একটা অদ্ভুত ডিম বেরল। মস্ত বড়, সরু লম্বা গড়ন, সেটা যে কিসের ডিম কেউ বলতে পারল না; কেউ বলে রাজহাঁসের ডিম, কেউ বলে কোনও জংলী পাখির ডিম, কেউ বলে কুমীরের ডিম। মা বললেন, "কিসের না কিসের ডিম তার ঠিক নেই, ওটা খেয়ে দরকার নেই।" ধনকাকা কিন্তু সে কথা শুনলেন না। বেশ করে পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে অমলেট ভাজিয়ে খেয়ে ফেললেন আর বললেন, "যারই ডিম হোক না কেন, খেতে ভা-রি উপাদেয়!"

নবম পরিচ্ছেদ

আমাদের ছেলেবেলায় বাংলা বইয়ে ভাল ছবি থাকত না, সে কথা আগেই বলেছি। যা কিছু সুন্দর ছবি আমরা বিলিতি বইয়েই দেখতে পেতাম। ভারতবর্ষে তখন ভাল ছবি তৈরী কিম্বা ছাপার কোনো উপায় ছিল না। বাবার প্রথম বই "ছেলেদের রামায়ণ" যখন প্রকাশিত হল, তাঁর নিজের হাতে আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবিগুলি ছাপতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলল। তখন থেকেই বাবা মনে মনে স্থির করলেন যে, আমাদের দেশে ভাল ছবি তৈরী ও ছাপার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকাল ভাল ভাল বই ও পত্রিকা ইত্যাদিতে যে-সব সুন্দর রঙ্গিন বা একরঙ্গা ছবি দেখতে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই হচ্ছে হাফ্‌টোন ছবি। এই হাফ্‌টোন ছবি কি করে তৈরী করতে হয়, সে বিষয়ে অনেক বই আনিয়ে বাবা পড়লেন, তারপর হাফ্‌টোন ছবি তৈরী করবার ক্যামেরা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম আনবার জন্য বিলেতে অর্ডার দিলেন। এ-সবের জন্য তো অনেক জায়গা দরকার হবে, তাই আমাদের অন্য একটা বাড়িতে উঠে যাবার কথা হল। তারপর একদিন বিরাট বিরাট প্যাকিং বাক্স করে বিলিতি মালপত্র এসে হাজির হল। আমরা সারাটা সকাল বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই সব মাল গোরুর গাড়ি থেকে নামানো আর ঘরে তোলানো দেখলাম। তার কিছু দিন পরেই আমরা নতুন বাড়িতে চলে এলাম।

মাঝারি রকমের বাড়ি, তার মধ্যে একটা ঘরে বাবা স্টুডিও তৈরী

করলেন, আরেকটা ঘরে ছোট একটি ছাপার প্রেস বসল, অন্য একটা ঘরে ও বড় বারান্দায় নানারকম যন্ত্রপাতি রাখা হল। একটা স্নানের ঘরকে করা হল ডার্ক রুম। তখন তো এদেশে কেউ এসব জানে না, বাবা বই পড়ে পড়ে নিজের হাতে তা পরীক্ষা করে সব শিখতে লাগলেন। এমনি করে আমাদের দেশে হাফ্‌টোন ছবি তৈরীর সূত্রপাত হল।

নতুন বাড়িতে ছোট ভাইয়ের জন্ম হল। দাদা ও মনির নামের সঙ্গে মিল দিয়ে তার নাম হল সুবিমল, ডাক নাম নানকু (ছোট্ট)। নানকু যখন মাত্র কয়েক দিনের, একদিন মা তাকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ চকাৎ চকাৎ শব্দ শুনে চেয়ে দেখেন, পাঁচ বছরের টুনী পান্তুয়া খেতে খেতে ফোঁটা ফোঁটা রস টিপে টিপে ভাইয়ের মুখে দিচ্ছে আর ভাই দিব্যি চক্‌চক্‌ করে খাচ্ছে। মহা খুশী হয়ে টুনী মাকে তা দেখিয়ে বলল, "দেখ মা, কী সুন্দর করে খাচ্ছে!" মা তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এখন ওকে ওসব জিনিস দিতে নেই। তারপর নানকু যখন ছ' মাসের, একদিন রাত তুপুরে জোর শব্দ শোনা গেল— "ওঁয়্যাও!" "ওঁয়্যাও!" শব্দ শুনে চমকে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। দিদি ভয় পেয়ে ডাকল—"ও মা, কোথায় বেড়াল ঝগড়া করছে?" মা হেসে বললেন, "বেড়াল নয়, আরেকটি নতুন ভাই এসেছে, তোমার কাকীমার খোকা হয়েছে।" খোকার হেঁড়ে গলা শুনে তো আমরা অবাক! নানকুর সঙ্গে মিল দিয়ে তার নাম হল পানকু।

নানকুর বাহন ছিল সখাওয়াৎ আলী। সাদা দাড়ি ও বাবরি চুল, সাদা পোশাক, মাথায় সাদা মসলিনের ফুলকাটা টুপী, সর্বদা হাসিমুখ, চমৎকার মানুষ। সে রোজ আমাদের বাড়িতে আসত, নানকুকে তুবেলা বেড়িয়ে না আনলে তার চলত না। নানকুও তার

আসবার সময় হলেই "সখাই !" "সখাই !" বলে চঞ্চল হয়ে উঠত। তাই তাকে নানকুর বাহন বলা হ'ত।

সখাওয়াৎ আলী আমাদের খুব ভালবাসত, প্রায়ই নানারকম ফুল এনে দিত। একদিন সে একরাশ বেলফুল নিয়ে এল। শ্বেত-পাথরের থালায় ধবধবে সাদা ফুল, সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। আমরা মহা খুশী হয়ে বললাম, ঠাকুরমাকে পুজোর জন্য পাঠিয়ে দিলে হয় না ? ও-ফুল ঠাকুরমার পুজোয় চলবে না শুনে আমাদের ভারি দুঃখ হ'ল। এমন সুন্দর ফুল, সখাওয়াৎ আলী এত ভাল আর এমন পরিষ্কার, ওর ফুলে পুজো হবে না ? কেন ?

নতুন বাড়িতে আমরা একটা আলাদা পড়বার ঘর পেয়ে খুব খুশী হলাম। এতদিন স্কুলের টিচার কুমুদিনীমাসী আমাদের বাড়িতে পড়াতেন, এবার এলেন মাস্টারমশাই। বেঁটেখাটো ফর্সা মানুষ, গম্ভীর লাল মুখ, দেখেই কেমন ভয় হল, মনে হল বুঝি খুব কড়া লোক। মনি তো প্রথমে কিছুতেই তাঁর কাছে পড়বে না ; হয় পালিয়ে যেত, নয় তো লুকিয়ে থাকত। অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেল। যেমন যত্ন করে পড়াতেন, তেমনি শক্ত হাতে পড়া আদায় করতেন। দুষ্টুমী করলে শাস্তি দিতেন, আবার পড়া ভাল করলে কত গল্প বলতেন, আর সুন্দর সুন্দর ছবি এনে দিতেন। সুরমামাসী আর দিদি কখনও দুষ্টুমী করত না, টুনী ছোট বলে তার দুষ্টুমী মাপ হয়ে যেত, শাস্তিটা জুটত দাদার, আমার, আর মনির ভাগ্যেই। শাস্তিও ছিল অদ্ভুত রকমের। কে কি খেতে ভালবাসে মাস্টারমশাইর সব খবর জানা ছিল! দুষ্টুমী করলে দাদার মাংস খাওয়া বন্ধ, মনির চা খাওয়া বন্ধ, আর আমার আম খাওয়া বন্ধ।

মাস্টারমশাই কখনও কামাই করতেন না আর ছুটির দিনেও পড়া

দিয়ে দিতেন, এই ছিল ভারি দুঃখ। একবার তিনি গরমের ছুটিতে বাড়ি গেলেন, আমাদের অনেক পড়া দিয়ে গেলেন। আমরা সারা ছুটিটা খেলা করে কাটালাম, পড়াটা শেষ ক'দিনের জন্য ফেলে রাখা হ'ল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মাস্টারমশাই ক'দিন আগেই বাড়ি থেকে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, আমরা কিছু পড়া করিনি। বারান্দায় বসে বাবা ছবি আঁকছেন, ঘরের মধ্যে মাস্টারমশাই আমাদের পড়াচ্ছেন আর ডেকে বলছেন—"তাতা রচনা লেখেনি", "খুশী অঙ্ক করেনি", "মনি হাতের-লেখা লেখেনি" ইত্যাদি। ছবি আঁকতে আঁকতেই বাবা বলছেন, "হুঁ।" পড়ানো শেষ করে মাস্টারমশাই তো চলে গেলেন। এখন, আমরা কোন মুখে বাবার সামনে বেরোই? মাস্টারমশাই সব বলে দিয়েছেন, তাই ভারি লজ্জা করছে। অথচ ঐ বারান্দা দিয়েই বাড়ির ভিতর দিকে আসতে হয়। শেষকালে দাদা এক বুদ্ধি দিল। বাবা এক মনে আঁকছেন, টেবিলের উপর ছোট্ট ঈজেলে ছবিটা খাড়া করা আছে, তাতে তাঁর মুখ ঢাকা পড়েছে। আমরা একে একে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দাটা পার হয়েই দে-ছুট্।

টুনী-মনির বইখাতা অনেক সময় মাটিতে ছড়ান থাকত বলে মাস্টারমশাই একদিন দাদাকে বললেন, "ওদের জিনিসপত্র যা কিছু এদিক-ওদিক পড়ে থাকবে তুমি তা বাজেয়াপ্ত করে তোমার ডেস্কে রাখবে।" দাদা আমাদের পেন্সিল ইত্যাদি যা কিছু কুড়িয়ে পেল সব ডেস্কে পুরল, তারপর টুনী মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে কি যেন করছিল, তাকেও চট করে তুলে নিয়ে ডেস্কবন্দী করল। অবিশ্যি নিঃশ্বাস নেবার জন্য ডালাটা একটু ফাঁক করে রেখেছিল। আমরা আপত্তি করাতে মুচকি হেসে বলল, "মাস্টারমশাইর অর্ডার—যা কিছু মাটিতে পড়ে থাকবে তাই ডেস্কে ভরতে হবে!" টুনীর চিৎকারে সুরমামাসী আর দিদি এসে তাকে উদ্ধার করল।

মনি কবিতা পড়তে খুব ভালবাসতো। পড়বার সময় উৎসাহে তার মুখ লাল হয়ে যেত, চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'ত, সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা নেড়ে অভিনয়ও চলত। একদিন সে মাস্টারমশাইর কাছে কবিতা বলছে—"সাপের মাথায় যেন ভেকে প্রহারয়।" বলার সঙ্গে সঙ্গে এমনি "প্রহার" করেছে যে, তার হাতের কলমের নিব্‌টা মাস্টারমশাইর হাতে একেবারে বসে গিয়েছে। ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল, মনিরও তেমনি ঝর ঝর করে কান্না! তারপর কতদিন পর্যন্ত আমরা ওকে "ভেকে প্রহারয়" বলে ক্ষেপাতাম।

সেই ছোট্টবেলা থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পর্যন্ত মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়েছি, কত আব্দার উৎপাত করেছি, দুষ্টুমী করে কত শাস্তিও পেয়েছি, কিন্তু তাঁর স্নেহ আর যত্ন পেয়েছি তার চেয়ে শতগুণে বেশি।

স্কুলে লেখাপড়া করতাম, বাড়িতে মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তাম, কিন্তু বাবার কাছে গল্পের মত করে মুখে মুখে কত কি শিখতাম, সেটাই সবচেয়ে ভাল লাগত। সহজ বিজ্ঞানের কথা, পৃথিবীর জন্ম-কথা, চাঁদ-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রের কথা; এমনি কত কি। বাবার দূরবীণ দিয়ে চাঁদটাকে কি সুন্দর উজ্জ্বল আর বড় দেখাত, চাঁদের পাহাড় আর গহ্বরগুলো কেমন স্পষ্ট দেখাত, শনিগ্রহের বলয়ও বেশ বোঝা যেত।

এমন সহজ আর সুন্দর করে বাবা বলতেন যে, কত সময়ে একজিবিশন কিংবা মেলায় গিয়ে দেখেছি, আমরা যেখানে যাচ্ছি, আমাদের ঘিরে একটা ছোটখাটো ভীড় জমা হয়ে যাচ্ছে। বাবা আমাদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন, চারদিক থেকে লোকে ঝুঁকে পড়ে হাঁ করে তাই শুনছে।

একবার এই রকম একটা একজিবিশনে বাবা একটা কল দেখিয়ে

আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তাতে কি রকম করে কাজ হয়। অনেক লোক দাঁড়িয়ে শুনছে, একজন খুব মোটা ভদ্রলোক ঠেলেঠুলে সামনে এসে একেবারে আমাকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কী করি? আস্তে আস্তে ভদ্রলোকের পিঠে সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করলাম। প্রথমে বোধ হয় পোকামাকড় মনে করে তিনি দুয়েকবার গা-ঝাড়া দিলেন, তারপর হঠাৎ চমকে ফিরেই একগাল হেসে বললেন, "ও বুড়ি, তুমি বুঝি দেখতে পাচ্চো না? এসো, এসো।" এই বলে আমাকে সামনে টেনে নিলেন। আরেক দিনের কথা মনে পড়ছে। আমরা রেলগাড়িতে চড়ে কোথায় যেন বেড়াতে যাচ্ছি, আর ক্রমাগত বাবাকে প্রশ্ন করে চলেছি—"এটা কি?" "ওটা কেন?" বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। খানিক পরে ওদিককার সীট্ থেকে একজন ভদ্রলোক উঠে এসে বললেন, "মাফ করবেন, আপনার সঙ্গে আলাপ না করে পারছি না। কী আশ্চর্য সুন্দর করে আপনি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেন! আমি এরকম আর দেখিনি।" আলাপ করে দুজনেই খুব খুশী হলেন, কারণ সেই ভদ্রলোকও একজন নামকরা লেখক। পরস্পরের লেখার সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল, এতদিনে সাক্ষাৎ পরিচয় হ'ল।
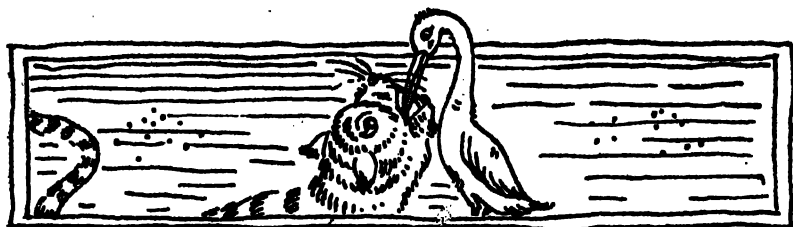
দশম পরিচ্ছেদ

নতুন বাড়িটা জ্যেঠামশাই ও পিসীমার বাড়ির কাছেই ছিল, সুতরাং খেলার সাথীর অভাব হ'ল না। জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো ভাইবোনদের দল জুটে গেল।

ছাতের এক কোণে ঘোলা জলের ট্যাঙ্ক থেকে গঙ্গামাটি তুলে জমা করা ছিল, তাই দিয়ে গোলাগুলি বানিয়ে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হ'ল। সে যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছিল পটগুল্‌টিশ্‌ ওয়ার। নরম কাদার গুলিতে খেলা বেশ ভালই চলছিল। হঠাৎ কি কুবুদ্ধি হ'ল গুলিগুলোকে বেশ লাল করে পুড়িয়ে নিলাম। তুপুরবেলায় যখন চাকরবাকররা বিশ্রাম করতে যেত, তখন চুপিচুপি রান্নাঘরে ঢুকে মরা উনুনের মধ্যে গুলি গুঁজে দিয়ে আসতাম, ওরা উনুন ঝাড়বার সময় সেগুলি বেছে ধুয়ে আমাদের দিয়ে দিত। কিন্তু তাতে তুপক্ষই এমন ভাবে "আহত" হতে আরম্ভ করল যে, আমাদের রান্নাঘরে যাওয়াই বারণ হয়ে গেল।

আরেকদিন জ্যেঠামশাইর বাড়িতে পটগুল্‌টিশ্‌ খেলা হচ্ছে, হঠাৎ একজনের হাতের গোলাটা ছিটকে সিঁড়ির ছাতের তলার দিকে (সিলিংএ) লেগে একেবারে ঘুঁটের মত চ্যাপ্টা হয়ে সেঁটে রইল। ভারি মজা, সবাই মিলে ঘুঁটে দেওয়ার পাল্লা শুরু করলাম। দেখতে দেখতে ছাতটা কাদার ঘুঁটেতে ভর্তি হয়ে গেল। এমন সময় জ্যেঠা-মশাইয়ের পায়ের শব্দ শুনে যে যেখানে পারল লুকিয়ে পড়ল। জ্যেঠা-

মশাইকে ও বাড়ির ছেলেরা ভীষণ ভয় করত। তাঁর চেহারা আর গলার আওয়াজ ছিল গম্ভীর। শুনতাম তিনি মস্ত বড় খেলোয়াড়, গায়ে খুব জোর, আর রাগও খুব। আমরা কিন্তু কোনোদিন তাঁর রাগ দেখিনি। যখনই ওবাড়ি যেতাম, দেখতাম তিনি একমনে লেখাপড়া করছেন। যদি কখনো আমাদের দিকে চোখ পড়ত, মৃদু হেসে দুয়েকটা কথা বলতেন। যা হোক, ওদের দেখাদেখি। আমরাও লুকোলাম।

জ্যেঠামশাই আনমনে কি ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, হঠাৎ থ্যাপ্ করে কি একটা তাঁর পায়ের কাছে পড়ল।
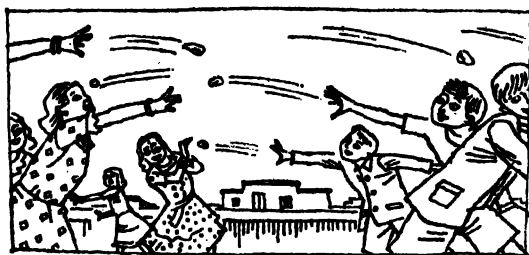
···ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। সে যুদ্ধের নাম পটগুলুটিশ্ ওয়ার···

চমকে উঠে তিনি গুরুগম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, "এই কে আছিস, আলো আন।" চাকর ছুটে গিয়ে সিঁড়ির আলোটা উস্কিয়ে সামনে ধরতেই দেখা গেল একতাল থলথলে কালোমতন কি জিনিস। ধমক দিয়ে বললেন, "এটা আবার কি, কোত্থেকে এল?" চাকর কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "আজ্ঞে, ছেলেরা কি যেন খেলা করছিল—" তখন কী ভেবে হঠাৎ উপর দিকে তাকিয়ে ছাতের ছিরি দেখেই জ্যেঠামশাই হো হো করে হেসে উঠলেন, আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আরেকদিন চোর-পুলিস খেলছি। দাদা হয়েছে পুলিস, আমি

চোর। আমার হাতে সাপমুখো বালা ছিল, তার একটার মুখ টেনে ফাঁক করে অন্য বালাটা তার ভিতর দিয়ে গলিয়ে দিব্যি হাতকড়ি বানিয়ে দাদা আমাকে ধরে নিয়ে চলল। আমি যেই এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়াতে গিয়েছি, অমনি নতুন বালা ভেঙে ছ'-তিন টুকরো হয়ে ছাতে ছড়িয়ে পড়ল। টুকরোগুলো কুড়িয়ে মার কাছে নিয়ে গেলাম। মা হেসে বললেন, "তোমাকে দেখছি এবার লোহার বালা গড়িয়ে দিতে হবে।"

ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলাতেও "হাতেখড়ি" ঐ ছাতেই আরম্ভ হয়েছিল। আমি একটু "দস্যি" ছিলাম কিনা, দাদাদের সঙ্গে যত সব

...কত
ডলি-পুতুল,
মাটির পুতুল,
পুতুলের খাটবিছানা,...
হাঁড়িকুড়ি হাতাবেড়ি,
কত
ঘরকন্না রান্নাবান্না...

হুড়োহুড়ি খেলায় খুব মজবুত ছিলাম। তেমনি আবার দিদিদের সঙ্গে পুতুলখেলাও চমৎকার লাগত। মা সুন্দর করে দোতলা পুতুল-ঘর সাজিয়ে দিয়েছিলেন...কত ডলি-পুতুল, কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, পুতুলের খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, টি-সেট, ডিনার-সেট, পিতল ও মাটির কত হাঁড়িকুড়ি হাতাবেড়ি, কত ঘরকন্না রান্নাবান্না। দিদিরা সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পুঁতির গয়না তৈরী করত, পুতুলের বিয়েতে ছোট ছোট পাতায় করে ছোট ছোট লুচি-মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়া হ'ত। একবার পুতুলের বিয়েতে আমরা ফুলপাতা নিশান দিয়ে বিয়েবাড়ি সাজিয়ে সারি সারি ছোট্ট ছোট্ট রঙিন মোমবাতি জেলে দিলাম, সবাইকে

ডেকে দেখালাম, কি সুন্দর দেখাচ্ছে! তারপর খাবার ডাক পড়তে সবাই নিচে চলে গেলাম। খাওয়া সেরে এসে দেখি, পুতুলঘরে সে এক অগ্নিকাণ্ড! ছোট্ট মোমবাতি কয়েক মিনিট জ্বলেই শেষ হয়ে গিয়েছে, নিশানটিশান পুড়ে এবারে কাঠের ছাত জ্বলতে আরম্ভ করেছে। তাড়াতাড়ি জল ঢেলে আগুন নিভানো হল, অল্পের জন্য পুতুলগুলো বেঁচে গেল।

আমাদের এক মজার খেলা ছিল "রাগ বানানো"। হয়তো কারো উপর রাগ হয়েছে অথচ তার শোধ দিতে পারছি না, তখন দাদা বলত, "আয়, রাগ বানাই!" বলেই সেই লোকটির সম্বন্ধে যা তা অদ্ভুত গল্প বানিয়ে বলতে আরম্ভ করত, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলতাম। তার মধ্যে বিদ্বেষ কিংবা হিংস্র ভাব কিছু থাকত না, সে ব্যক্তির কোনও অনিষ্ট চিন্তা থাকত না, শুধু মজার মজার কথা। যত রকম বোকামি হতে পারে, যত রকমে মানুষ নাকাল ও অপ্রস্তুত হয়ে হাস্যাস্পদ হতে পারে, সব কিছু সেই লোকটির সম্বন্ধে কল্পনা করে আমরা হেসে কুটিপাটি হতাম। দাদার "হ-য-ব-র-ল" বইয়ের "হিজি-বিজ্-বিজ্" যেমন "মনে কর—" বলে যত রকম সব উদ্ভট কল্পনা করে নিজে নিজেই হেসে দম বন্ধ হবার উপক্রম করে, আমাদেরও প্রায় সেই দশাই হ'ত। কিন্তু মজা হ'ত এই যে, হাসির স্রোতে রাগটাগ সব কোথায় ভেসে যেত—মনটা আবার বেশ হাল্কা খুশীতে ভরে উঠত।

আর একটা মজার খেলা ছিল, কবিতায় গল্প বলা। একটা কোনো জানা গল্প নিয়ে একজন প্রথম লাইনটা বানিয়ে বলবে, আরেকজন তার সঙ্গে মিল দিয়ে দ্বিতীয় লাইন বলবে, তার পরের জন তৃতীয় লাইন, এমনি করে গল্পটা শেষ করতে হবে। যদি কেউ না পারে সে হেরে গেল, তার পরের জন বলবে। খুব জমত এই খেলাটা। বাবা

কাকারাও এতে যোগ দিতেন। দাদা কখনও হার মানত না। যত শক্ত হোক না কেন চট করে মিলিয়ে দিত। যেমন একদিন হচ্ছে 'বাঘ ও বক'-এর গল্প—

"একদা এক বাঘের গলায় ফুটেছিল অস্থি।"
"যন্ত্রণায় কিছুতেই নাহি তার স্বস্তি।"
"তিন দিন তিন রাত নাহি তার নিদ্রা।"
"সেঁক দেয় তেল মাখে, লাগায় হরিদ্রা—"

এই রকম চলতে চলতে সুন্দরকাকা যেই বললেন—

"ভিতরে ঢুকায়ে দিল দীর্ঘ তার চঞ্চু।"

কেউ আর তার মিল দিতে পারে না। আমরা সবাই "পাস" দিয়ে দিলাম, দাদার পালা আসতেই সে চট করে বলল—

"বক সে চালাক অতি চিকিৎসক-চুঞ্চু!"

আমরা চেঁচামেচি করে উঠলাম, "ওসব যা তা বললে হবে না। 'চুঞ্চু' আবার কি কথা?" সুন্দরকাকা খুশী হয়ে দাদার পিঠ চাপড়ে বললেন, " 'চুঞ্চু' মানে ওস্তাদ, এক্সপার্ট।"

ছোটবেলা থেকেই দাদা কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিল। আট বৎসর বয়সে তার প্রথম কবিতা 'নদী' আর নয় বৎসর বয়সে দ্বিতীয় কবিতা 'টিক্ টিক্ টং' 'মুকুল' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

দাদার দেখাদেখি আমারও শখ হল কবিতা লেখার। একটা খাতায় বেশ ফুললতাপাতা এঁকে লুকিয়ে দুয়েকটা কবিতা লিখলাম, তারপর একটা গল্প লিখতে আরম্ভ করলাম। একদিন দুপুরে বসে গল্প লিখছি, বাবার কাছে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। তাঁকে বসিয়ে বাবাকে ডেকে দিলাম, বাবা এসে তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পসল্প করলেন, তারপর দুজনে একসঙ্গে কোথায় বেরিয়ে গেলেন। আমার খাতাটা টেবিলে ফেলে এসেছিলাম, ওঁরা চলে

যেতেই তাড়াতাড়ি খাতাটা আনতে গিয়ে দেখি, আমার সেই অর্ধেক লেখা গল্পটার পাতায় 'তারপর হল কি' বলে বাকি গল্পটা সেই ভদ্রলোক নিজেই লিখে শেষ করে রেখেছেন। তিনি ছিলেন তখনকার একজন নামকরা লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত! বড় হয়ে তাঁর লেখা অনেক সুন্দর গল্প 'প্রবাসী'তে পড়েছি। আমার খাতায় তাঁর লেখাটা নিশ্চয়ই খুব ভাল হয়েছিল, কিন্তু তখন আমার মনে কি হয়েছিল জান? মনে হ'ল: আমার গল্পটা মাটি হয়ে গেল! মনের দুঃখে খাতাটা ছিঁড়েই ফেললাম।

বাবা যখন বিদেশে কোথাও যেতেন, মজার মজার ছবি আর পদ্যে আমাদের চিঠি লিখতেন। আমাদের পড়া হয়ে গেলে সেগুলি কত লোকের হাতে হাতে ঘুরত। সেসব যদি সংগ্রহ করা থাকত, তাহলে তাই দিয়ে ভারি মজার একটা বই হতে পারত। তার দুয়েকটা কিছু কিছু মনে পড়ে। মধুপুরে সেই রেলগাড়ির পদ্যটা লিখেছিলেন, তা তো আগেই শুনিয়েছি। ময়মনসিংহ শহর থেকে সতীশমামাকে ময়মনসিংহী ভাষায় লিখেছেন—

সৈত্যাদ্দা, হাঃ-হাঃ-হাঃ!
কথাডা শুইন্যা যা,
কৈলকাত্তা বৈস্যা খা
দৈ ছানা, ঘী, পাঁঠা।
ময়মন্‌সিং ঘোড়াচ্ছিন্‌!
দেখবার নাই কিচ্ছু ভাই,
সার্ভেন্ট ইজ্‌ ইস্টুপিড্‌
রাইন্ধ্যা খোর খাইচ্ছ্যা ভাই।

কোনো বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে লিখেছেন—

মাগো আমার সুখলতা,
টুনী, মনি, খুশী, তাতা
কাল আমি খেয়েছি গোগো
কি ভয়ানক নেমন্তন্ন

জলে থাকে একটা জন্তু
দেখতে ভয়ানক কিন্তু !
মাছ নয়, কুমীর নয়,
করাত আছে—ছুতার নয়,
লম্বা লম্বা দাড়ি রাখে,
লাঠির আগায় চোখ থাকে,
তার যে কতগুলো পা
ঢের লোকে তা জানেই না।
দুটো পা যে ছিল তার
বাপ রে, সে কি বলব আর !
চিমটি কাটতো তা দিয়ে যদি,
ছিঁড়ে নিতো নাক অবধি !

চিঠিতে জন্তুটার একটা ছবিও ছিল। এটা কি জন্তু, বল তো ?

একাদশ পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মকাল। সেদিন ছিল মহরম। আমরা সারাদিন মেলা ও মিছিল দেখে বিকালে জলখাবারের পরে খেলা করছি, হঠাৎ গুম্ গুম্ শব্দ শুরু হল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওটা কিসের শব্দ, বাবা ?" বাবা একমনে শব্দটা শুনছেন, এমন সময় মাটি কেঁপে উঠল, ঘরবাড়ি দুলতে লাগল। মা বললেন, "ভূমিকম্প হচ্ছে।" তারপরেই চারদিক থেকে রব উঠল, "ভূমিকম্প !" "ভূমিকম্প !" চারদিকে শাঁখ বাজতে লাগল আর লোকেরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। আমরাও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পাশের ছোট্ট মাঠটুকুতে গিয়ে দাঁড়ালাম। টুনী কাঁদতে লাগল—তার ডলি-পুতুলকে ফেলে এসেছে। চোখের সামনে রাস্তার ওপারের বাড়িটার ছাতের পাঁচিল ভেঙ্গে পড়ল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে সেইখান দিয়ে পিসীমার আয়া তাঁর ছোট্ট খোকাকে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে "হেই, মামীমা !" বলে মা'র পায়ের কাছে বসে পড়ল। আমাদের মায়ের উপর তার ভারি ভক্তি, তাই এই বিপদে সে মামীমা'র কাছেই আশ্রয় নিতে ছুটে এসেছে। পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল, খোকার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। কি ভাগ্যি যে তার গায়ে ইঁট লাগে নি।

তারপর আস্তে আস্তে দুলুনি থেমে সব স্থির হয়ে গেল। আমরা আবার বাড়ির ভিতর চলে এলাম। একটু পরেই ঝি কাঁদতে কাঁদতে এসে খবর দিল—"ইস্কুলবাড়ি ভেঙ্গে গিয়েছে, মেয়েরা সব চাপা পড়েছে।"

বাবা আর কাকারা তখনই ছুটে গেলেন, খানিক পরে ফিরে এসে বললেন যে, বাড়ি অনেকটা ভেঙ্গেছে বটে কিন্তু কেউ চাপা পড়েনি। দাদামশাইরা তখনও সেই বাড়িতে থাকতেন, তাঁরাও সকলে নিরাপদে আছেন। বোর্ডিংয়ের মেয়েরা সদর দরজা দিয়ে বেরোবার পরমুহূর্তেই দোতলার বারান্দা ভেঙ্গে সদর দরজার উপরে পড়েছিল। অল্পের জন্য মেয়েরা বেঁচে গিয়েছে। আমাদের বাড়িটা নতুন বলে তার কিছুই হয়নি। পরে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম কত জায়গায় কত বাড়ি ভেঙ্গেছে, "জোড়া-গির্জার" ছুটো চূড়োর একটা ভেঙ্গে গিয়েছে।

দেশ থেকে খবর এল, সেখানে ভূমিকম্প খুবই বেশী হয়েছে, আমাদের শহরের দোতলা বাড়িটা ভেঙ্গে একতলা হয়ে গিয়েছে। কত জায়গায় মাটি ফুঁড়ে গরম জলের ফোয়ারা উঠেছে, কোথাও নিচু জমি উঁচু হয়ে উঠেছে, আবার কোথাও উঁচু জমি নিচু হয়ে গিয়েছে। এক জায়গায় প্রজাদের জলকষ্ট ছিল বলে অল্পদিন আগেই বাবা সেখানে মস্ত একটা পুকুর কাটিয়ে দিয়েছিলেন, সুন্দর পরিষ্কার জল থৈ-থৈ করছিল। ভূমিকম্পের পর দেখা গেল—কোথায় জল? শুকনো বালি ধু-ধু করছে। শিলংয়ে আরো ভয়ানক কাণ্ড। আমাদের আত্মীয় একজনরা সেখানে ছিলেন, তাঁরা সকলেই বাড়িচাপা পড়েছিলেন, তাঁদের ছোট্ট মেয়েটি মারা গিয়েছিল। শহরের কত বাড়ি ভেঙ্গেছিল, অনেক লোক মরেছিল।

আমাদের স্কুল তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। ছুটির পরে যখন খুলল, তখন স্কুলবাড়ি মেরামত হয়ে গিয়েছে, ভূমিকম্পের আর কোনো চিহ্ন নেই। শুধু আমাদের ক্লাসের পাগ্‌লা শু—, পড়ার মাঝখানেই মাঝে মাঝে হঠাৎ লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠত— "ভয়ঙ্কর ভূমিক-ম্‌-পো...দেখেশুনে হৃৎক-ম্‌-পো..."

মাথাপাগলা বলে তাকে কেউ কিছু বলতেন না।

ভূমিকম্পের পরে এল প্লেগ। এ-রোগটা আগে আমাদের দেশে ছিল না, বোধ হয় বিদেশ থেকে জাহাজে কোনো রোগী এটা এনেছিল। প্রথমে বোম্বাইয়ে দেখা দিল, তারপর ক্রমে ছড়াতে ছড়াতে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে চলল। কত শহর গ্রাম উজাড় হয়ে গেল, হাজার হাজার লোক মারা গেল, বাকি সব ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। নতুন রোগ, এর চিকিৎসা কেউ তখন জানে না, কি করে এ রোগ এড়ান যায় তাও জানে না। প্লেগ যতই কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছে, ততই লোকের ভয় বাড়ছে। সে কী ভীষণ ভয়! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেমন বোমার ভয়ে লোক পালিয়েছিল, তেমনি প্লেগের ভয়ে "দু'দিনে দু'লক্ষ লোক" কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

আমরাও জ্যেঠামশাই পিসীমা ও কাকাদের সঙ্গে প্রকাণ্ড দল বেঁধে দেশে পালালাম। স্টেশনে, ট্রেনে কী অসম্ভব ভিড়! আবার জাহাজে উঠে সে কী ভীষণ ঝড়! লোকে বলছে, "এইবার জাহাজ ডুববে।" আমরা ছুটে বাবার কাছে যাচ্ছি—বাবা আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন, এমনি করতে করতে শেষ পর্যন্ত যা হোক নিরাপদেই ওপারে পৌঁছান গেল।

বাবার ময়মনসিংহ শহরে কি কাজ ছিল, আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে ছোটখাটো শহরটি, নদীর ধারটা বেশ সুন্দর লাগত। বাবা প্রায়ই দাদাদের সঙ্গে নিয়ে নদীতে স্নান করতে যেতেন, আমিও মাঝে মাঝে সঙ্গে যেতাম। এখানে এখনো ভূমিকম্পের চিহ্ন চারিদিকে দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাড়িতে মিস্ত্রীর কাজ তখনও শেষ হয়নি। বুড়ো সর্দার-মিস্ত্রীর দাড়ি দেখেই 'সখাই' মনে করে নানকু ঝাঁপিয়ে তার কোলে গেল। আমাদের বাড়ির সামনেই মহারাজ সূর্যকান্তের প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছিল। আয়নায় মোড়া ছিল তাঁর ঘরের

দেয়াল, সোফা-চেয়ার-টেবিলের পায়া, সিঁড়ির রেলিং, সব সুন্দর ফুলকাটা কাঁচের তৈরী ছিল, তাই লোকে সেটাকে বলতো 'ক্রস্ট্যাল প্যালেস'। ভূমিকম্পে সে স্ফটিক-প্রাসাদ গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে, পাহাড়ের মত পড়ে রয়েছে তার ধ্বংসস্তূপ। পাড়ার ছেলেপিলেদের কাছে সেটা ছিল 'রত্ন-খনি'। কত সুন্দর রঙ্গীন, ফুলকাটা, পল্‌কাটা কাঁচের টুক্‌রো তারা সেই স্তূপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে হীরে মানিকের মত আদর করে নিয়ে আসত।

আমাদের বাড়ির পিছনে, খিড়কী পুকুরের ওপারে, কাদের একটা পোড়ো জমি ছিল। লতায় পাতায় জড়ান বড় বড় গাছ, তার নীচে কাঁটাঝোপ। শেয়াল, হনুমান, বড় জোর দু'চারটা সাপখোপ, তার বেশী কিছু হয়ত সেখানে ছিল না। দাদারা কিন্তু এপার থেকেই খেলার বন্দুক দিয়ে তার মধ্যে হাতি-বাঘ-গণ্ডার অনেক কিছুই কল্পনায় শিকার করত। একদিন সেই জঙ্গলের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শুনে আমরা ভাবলাম সত্যিই বুঝি কেউ কিছু শিকার করছে। তারপর শুনলাম যে, ওগুলো বন্দুক নয়—'গিলা' ফাটছে। গিলা-গাছের প্রকাণ্ড শিমের মত দেখতে ফল হয়, পাকলে পরে সেগুলো বন্দুকের মত জোরে ফট্রাস্‌ করে ফাটে আর তার বড় বড় চ্যাপ্টা চকোলেট রঙের বীচিগুলো অনেক দূর পর্যন্ত চারদিকে ছিটকে পড়ে। ছেলেবেলায় দেখতাম, ঐ বীচি দিয়ে চাকররা কেমন কায়দা করে ধুতি চাদর জামা কুঁচিয়ে দিত। ধনকাকা ঐ রকম 'গিলে-করা' জামাকাপড় পছন্দ করতেন।

ছুটির পরে যখন ফিরলাম তখন কলকাতায় প্লেগ এসে গিয়েছে। বড় ইঁদুর থেকে প্লেগের বীজাণু ছড়ায় সে খবর জানা গিয়েছে, তাই চারিদিকে ইঁদুর মারার ধুম চলেছে। প্লেগের টিকেও ততদিনে বেরিয়েছে, কিন্তু তাও কেউ ভয়ে নিতে চায় না। তখনকার দিনে প্লেগের ইন্‌জেক্‌শন

নিলে খুব ব্যথা হত, হাত ফুলে জ্বর হত। তাই গুজব রটে গেল যে, টিকা না নিলে যদি বা রক্ষা আছে, টিকা নিলে আর রক্ষা নেই, নির্ঘাৎ প্লেগ হবে। লোকের মনের এই ভুল ধারণা ভাঙবার জন্য আমাদের দাদামশাই তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাইকে অনুরোধ করলেন প্লেগের টিকা নেবার জন্য। আমরা প্রায় আড়াই শ লোক ছোট বড় ছেলে মেয়ে সব জড়ো হয়ে স্কুলবাড়িতে একসঙ্গে টিকা নিলাম আর সেই খবরটা সমস্ত সংবাদপত্রে ছাপান হল, যাতে লোকের মনের ভয় ভেঙ্গে যায়।

এর কিছুদিন পরে দাদামশাইর খুব অসুখ হল। সবাই খুব ব্যস্ত, বাবা-মা ক্রমাগত ও-বাড়িতে যাওয়া-আসা করছেন। হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে সখাওয়াৎ আলী ছুটে এল, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বাবাকে বলল, "বাবু, সব শেষ!" বাবা আস্তে আস্তে বললেন, "খোদার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।" বুঝলাম, দাদামশাই আর বেঁচে নেই।

দাদামশাই নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে আমরা তাঁর কাছে ঘেঁষবার অবসর বেশী পেতাম না। মাঝে মাঝে গাড়ি করে আমাদের গড়ের মাঠে ও গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতেন, তখন তাঁর সঙ্গে বেশ হাসি গল্প হ'ত। সবাই বলতেন যে অতিরিক্ত পরিশ্রমেই দাদামশাইর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। সারাজীবন তিনি দেশ ও সমাজের সেবায়, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা ও কল্যাণের জন্য, অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছিলেন। তখন ছোট ছিলাম, সেসব কাজের মূল্য তো ভাল করে বুঝতাম না, কিন্তু তাঁর সাহস ও গায়ের জোরের কথা, বিশেষ করে 'সাহেব ঠ্যাঙ্গানো'র গল্প শুনতে খুব ভাল লাগত।

তখনকার দিনে আসামের চা-বাগানে যারা মজুরী করতে যেত, তাদের ভারি দুরবস্থা ছিল। তাদের অনেক সময়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠকিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে তাদের উপর নানারকম অত্যাচার

হত, সেখান থেকে পালিয়েও আসতে পারতো না। এই নিয়ে দেশে বেশ একটা আন্দোলন হয়েছিল, যার ফলে তাদের অবস্থার অনেক উন্নতি হল। এই আন্দোলনের সময় দাদামশাই নিজে 'কুলী' সেজে, বাগানে বাগানে ঘুরে, মজুরদের দশা স্বচক্ষে দেখে, খবরের কাগজে সেসব কথা প্রকাশ করেছিলেন। এতে কোনো কোনো বাগানের অত্যাচারী কর্তারা ভয়ানক রেগে গিয়ে তাঁকে ধরবার ও তাড়াবার নানারকম চেষ্টা করেছিল, খুন করবার চেষ্টা করতেও ছাড়েনি। কিন্তু তিনি তাতে ভয় না পেয়ে, সব বাধা বিপদের মধ্যেও নিজের কর্তব্য সেরে এসেছিলেন।

সাহেবদের সে সময়ে খুব প্রতাপ ছিল, সাধারণ লোকে তাদের ভয় করে চলত। ভাল সাহেবও অবিশ্যি অনেক ছিল, আবার অনেকেই 'কালা আদমি'দের অবজ্ঞার চোখে দেখত, তাদের সঙ্গে নানারকম খারাপ ব্যবহার করত। কেউ তাদের কিছু বলতে সাহস করত না। দাদামশাই ভারি তেজী মানুষ ছিলেন, অন্যায় কিছুতেই সইতে পারতেন না। কোথাও দুর্বলের উপর অত্যাচার হতে দেখলেই তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে যেতেন। ভাল কথায় তো সব সময়ে কাজ হয় না, অনেক সময় তাঁকে হাতাহাতি মারামারিও করতে হয়েছে, কিন্তু সাহস ও গায়ের জোরে তাঁরই জয় হয়েছে। কোথায় কোন দুষ্টু সাহেব গরীবের জিনিষ কেড়ে নিচ্ছে দেখলেই, তাকে উচিত দাম দিতে কিম্বা জিনিষ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেছেন; নিরীহ ভদ্রলোককে অপমান করতে দেখে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছেন, কেমন করে ছাতা হাতে তিনি একাই কয়েকজনের সঙ্গে লড়াই করেছেন, তারপর তারা হেরে গিয়ে হ্যাণ্ড্‌শেক্ করতে এলে হাত গুটিয়ে নিয়ে বলেছেন—"আই ডোণ্ট্ শেক্ হ্যাণ্ড্‌স্ উইথ্ কাওয়ার্ড্‌স্", লোকের মুখে এই সব গল্প শুনে আমরা বেশ আনন্দ আর গর্ব বোধ করতাম।
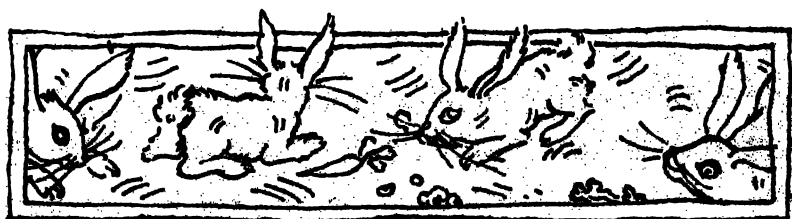
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমাদের বাড়িতে সর্বদাই অতিথি সমাগম হত। এমন সময় খুব কম যেত যখন বাড়িতে একটিও উপরি লোক নেই। একবার একজন ফরাসী মেম কিছুদিন আমাদের বাড়িতে রইলেন। বাবার চেনা একজন আর্টিস্টের সঙ্গে এঁর বিয়ে ঠিক হয়েছে। এদেশে তো এঁর আত্মীয় কেউ নেই, তাই আমাদের বাড়ি থেকে বিয়ে হল। মেমসাহেব বেশ হাসিখুশী আর আধো-আধো করে ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজী বলেন, দেখে আমাদের ভরসা হল। আমরাও তো তখন ভালো করে ইংরেজী বলতে শিখিনি! মেমসাহেবকে তাঁর ঘরে বসিয়ে, মা বারান্দায় আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, হঠাৎ মেম ছুটে গিয়ে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে সরু গলায় কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—"বীস্ত্!" "বীস্ত্!" দোতলার ওপরে আবার "বীস্ট্" কিরে বাবা! আমরা তো অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, তখন মেমসাহেব আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—ঘরের দেয়ালে একটা টিকটিকি! বিলেতের লোকেদের অনেকের মনে ধারণা থাকে যে ইণ্ডিয়ানরা সবাই বুঝি বেজায় বড়লোক হয়। আমাদের খাবার ঘরে ঢুকে এতগুলি লোকের সারি সারি কাঁসার থালা-বাটি, রেকাব-গেলাস দেখেই মেমসাহেব একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইজ্ ইত্ অল্ গোল্দ্?"

বাবার এই বন্ধু আমাদের দু'জোড়া খরগোশ দিয়েছিলেন। ধবধবে সাদা রং, লাল কাঁচের মত চোখ, ঠোঁট নাক আর লম্বা কানের ভিতর

দিকটা গোলাপী, ভারি সুন্দর। প্রথমে আমাদের দেখে ভয় পেত, পরে হাত থেকে ঘাস, ছোলা ইত্যাদি খেত। পানের বোঁটা খেতে খুব ভালবাসতো। ওদের গলায় রিবন দিয়ে ঘুঙুর বেঁধে দেওয়া হল। খরগোশের যখন বাচ্চা হল, নীচের একটা ঘরে ওদের বন্ধ করে রাখা হল। সকালে উঠে দেখি, পিছন দিকের জানালা ফাঁক করে আমাদের বেড়ালটা কখন ঢুকে কয়েকটা ছানাকে খেয়েছে আর বাকি গুলোকে মেরে রেখেছে।

এই বেড়ালটাকে কয়েক মাস আগে বৃষ্টিতে ভিজে কাদা মেখে

…"বীস্ত!" "বীস্ত!" দোতলার ওপরে আবার "বীস্ট্"…

মিউ-মিউ করে কেঁদে বেড়াতে দেখে মনি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। তখন ছোট্ট ছিল, স্নান করিয়ে দেওয়াতে বেশ পরিষ্কার হল আর খেয়েদেয়ে যত্ন পেয়ে দেখতে দেখতে বেশ বড় হয়ে গেল। বেড়ালের কীর্তি দেখে আমাদের ভয়ানক রাগ আর দুঃখ হল। ওকে সবচেয়ে কঠিন কি শাস্তি দেওয়া যায়, সেই পরামর্শই চলল। কেউ বলল, "ওকে দূর করে তাড়িয়ে দাও।" কেউ বলল, "খুন করেছে, হয় ফাঁসি দাও নয়তো গলা কেটে দাও।" কেউ বা আবার বলল, "গলা যদি

কাটো, তাহলে তক্ষুনি ছাই-চাপা দিতে হবে কিন্তু!" (কথাটা কার কাছে শুনেছিলাম মনে নেই, কিন্তু তখন আমাদের মনে বিশ্বাস ছিল যে, বেড়ালের গলা কেটে তক্ষুনি ছাই-চাপা দিয়ে দিলে কাটা গলা আবার জোড়া লেগে যায়।) মনিরও তাই মত, কারণ বেড়ালটা তারই। দাদা কিন্তু বলল, "না, ওসব শাস্তি দিতে পারবে না। ও কী বোঝে? মরা বাচ্চাগুলো দেখিয়ে ওকে বেশ করে পিটি দিয়ে দাও, তাহলেই আর কখনও এরকম করবে না।" এরকম গুরু পাপে লঘু দণ্ড আমাদের পছন্দ হল না। বাবার কাছে বিচারের জন্য গেলাম। বাবাও বললেন, "ও তো জানে না, ওর খাদ্য ও পেয়েছে তাই খেয়েছে। আমাদেরই আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল, যাতে ও নাগাল না পায়।"

এর পরের বার যখন খরগোশের বাচ্চা হল, তখন খুব যত্ন করে সাবধানে রাখলাম। প্রথমে ইঁদুরছানার মত বিশ্রী ন্যাড়া ছিল, তারপর যখন লাল পুঁতির মত চোখ ফুটল আর ফুরফুরে নরম লোম গজাল, কী সুন্দর যে দেখতে হল। একেবারে আট-দশটা করে বাচ্চা হত, কত লোকে চেয়ে নিত। প্লেগ আসবার পরে ডাক্তাররা বললেন কি, "খরগোশ বাড়ির মধ্যে রাখা উচিত নয়। ইঁদুরের মত ওরাও প্লেগ আনতে পারে।" সেই সময়ে আমাদের পরিচিত একজন খরগোশ চেয়ে নিলেন। তাঁদের শহরের বাইরে অনেক জমি আছে, বাড়ি থেকে দূরে খরগোশ পুষতে পারবেন।

এবার আমরা পড়ার ঘরের বারান্দায় মাটির টবের মধ্যে লাল মাছ পুষলাম। জলের ভিতর শামুক-ঝিনুক, নুড়ি-পাথর, ঝাঁজি-শ্যাওলা সাজিয়ে দিলাম। মেছুনী পুকুর থেকে টাটকা ঝাঁজি এনে দিত। রোজ খাবার দিতাম, জল বদলিয়ে দিতাম, দেখতে দেখতে বেশ বড় হয়ে উঠল মাছগুলো। এই সময়ে আমাদের স্কুল সেই বড় বাড়িটা

ছেড়ে একটা বাগানবাড়িতে উঠে গেল। বাগানের মাঝখানে একটা ফোয়ারা ছিল, এখন তার মুখটা ভেঙ্গে গিয়েছে, কিন্তু মস্ত গোল চৌবাচ্চাটা রয়েছে। তার মধ্যে লাল মাছ দেওয়া হল। আমরাও একদিন আমাদের মাছগুলোকে বোতলে ভরে নিয়ে গিয়ে সেই চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিলাম বেশী জলের মধ্যে বেশ আরামে থাকবে বলে। রোজ স্কুলে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমেই আগে ছুটে যাই মাছ দেখতে। আমাদের মাছগুলো অনেক বড় কিনা, দেখেই চিনতে পারি। একদিন দেখি ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি করছে, "জলে ভীষণ পোকা কিলবিল করছে— মালীরা একদিনও জল বদলায় না।" আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, পোকাগুলো ঠিক ক্ষুদে ক্ষুদে কালো মাছের মত দেখতে। বললাম, "না, পোকা নয়, বোধ হয় মাছের বাচ্চা।" কেউ আমার কথা বিশ্বাস করল না, উল্টে আমাকে ঠাট্টা করতে লাগল। হেডমিস্ট্রেস পর্যন্ত এসে দেখে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। আমার মনে মনে ভারি রাগ হল। বিকালে বাবা কি কাজে যেন স্কুলে গিয়েছিলেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে দেখালাম। বাবা দেখেই বললেন, "হ্যাঁ, এগুলো মাছের বাচ্চা।" তখন আমাদের স্ফূর্তি দেখে কে। ক্রমে বাচ্চাগুলো বড় হল। প্রথমে ছাই রং, তারপর গোলাপী, শেষে লাল রং হল। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে, এমন সুন্দর লাগত দেখতে! আমরা কত সময় অন্য খেলা ফেলে চৌবাচ্চা ঘিরে দাঁড়িয়ে মাছের খেলা দেখতাম। কিছুদিন পরে মনে হল যেন মাছ ক্রমে কমে যাচ্ছে। কমতে কমতে যখন প্রায় অর্ধেক হয়ে এল, তখন আমরা খুব চেঁচামেচি করাতে মালীরা জলে নামল। চৌবাচ্চার মধ্যে থেকে বেরোল এই বড় বড় মোটা মোটা দুই কোলাব্যাঙ। ঐ রাক্ষস দুটোই সব মাছ খেয়ে শেষ করছিল।

এবার এল ছোট্ট একটা কচ্ছপ। চার-পাঁচ আঙুলের বেশী

লম্বা হবে না, পিঠটা ব্রাউন আর তলার দিকটা ব্রাউনে-গেরুয়াতে সুন্দর চিত্র-বিচিত্র করা। ও নাকি বয়েসে বাড়লেও আয়তনে আর বাড়বে না, ঐ রকমই ছোট্ট জাত। ভয় পেলেই মাথা-পা সব গুটিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে নিত, আবার একটু পরে গলা বার করে কালো পুঁতির মত গোল গোল চোখ দিয়ে দেখত, কুর্‌কুর্‌ করে হাঁটত। ওকে আমরা সেই মাটির গামলায় জল দিয়ে ঝিনুক পাথর সাজিয়ে দিলাম, জলের মধ্যে একটা ছোট বাক্স খাড়া করে গুহা বানিয়ে দিলাম। গামলার উপর একটা তক্তা আড়ভাবে ব্রীজের মত করে দিয়ে আরেকটা তক্তা তার উপর থেকে ঢালু করে জলে নামিয়ে

দাদা ডাকছে,
"জঞ্জাল! জঞ্জাল!"
কিন্তু
সে আর আসে না।
ব্যাপার কি?...
কোন অদৃশ্য হস্ত
ওর ঝুঁটি
পাকড়ে ধরল!

দিলাম। সেই ঢালু তক্তা বেয়ে ব্রীজের উপর উঠে রোদ পোহাত আর গুহার মধ্যে ঢুকে ঘুমাত।

বেশ ছিল, হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি, রাত্রে কে ওকে বাক্সটা উপুড় করে চাপা দিয়ে তার উপরে পাথরগুলো চাপিয়ে দিয়েছে, বেচারা দমবন্ধ হয়ে মরে রয়েছে। "কে করলো?" "কে করলো?" খোঁজ করে জানা গেল যে, একজন নতুন চাকর: নাম জঞ্জাল; কাজেও জঞ্জাল! তারই এই কাজ। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "কি করেছ, দেখ ত? কেন এমন করলে?" সে কাঁদো-কাঁদো

হয়ে হিন্দী-বাংলায় বলল, "হামি ভাবলুম কি বিলাড়ি উলাড়ি খাইয়ে যাইবে, তাই-সে আচ্ছা কর্‌কে ঢাকিয়ে রাখলুম!" এমন বোকা লোককে নিয়ে কী করা যায়? মনে পড়ে গেল পাড়ার সেই ভদ্রমহিলার কথা। তিনি আমাদের লাল মাছ দেখে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমার ছেলেও এই রকম মাছ এনেছিল, রাত্তিরে পাছে বেড়ালে খেয়ে যায়, তাই বেশ করে বোতলে ছিপি এঁটে রাখলাম। ওমা! সকালে উঠে দেখি স-ব কটা মরে রয়েছে।"

দাদা কি কাজে ডাকছে, "জঞ্জাল! জঞ্জাল!" কাছেই কোথাও থেকে ক্ষীণ স্বরে উত্তর আসছে, "যাই। যাই!" কিন্তু সে আর আসে না। ব্যাপার কি? ঘর থেকে বেরিয়ে দেখা গেল বারান্দার দড়িতে জামাকাপড় শুকোচ্ছিল, দৌড়ে আসতে আসতে তারই একটার হুকে ওর সুপুষ্ট টিকিটি আটকে গিয়েছে। বেচারা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে—কোন্ অদৃশ্য হস্ত ওর ঝুঁটি পাকড়ে ধরল। ভয়ে হাত দিয়ে দেখবার চেষ্টা পর্যন্ত করছে না।
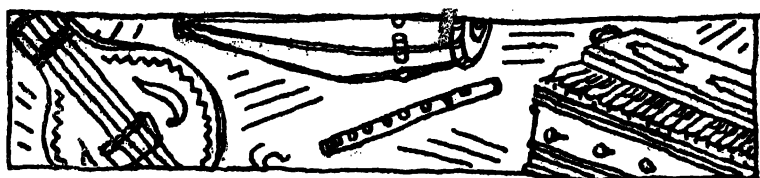
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হাফটোন্ ছবি ছাপার প্রণালী নিজের চেষ্টায় শিখে নিয়ে বাবা কয়েকটি লোককে শিখিয়ে তৈরী করে নিলেন, তারপর আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর ছবি ছাপার জন্য ভালরকম আয়োজন করলেন। এবার আমরা আরো বড় একটা বাড়িতে উঠে এলাম। এখানে তিনতলার উপরে কাঁচের ছাতওয়ালা সুন্দর স্টুড়িয়ো তৈরী হল। মেঘলাদিনে অথবা রাত্রে সূর্যের আলোর কাজ চালাবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আর্ক-ল্যাম্প এল, নতুন ক্যামেরা, প্রেস এবং আরো অনেক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এল। বিস্তর টাকা খরচ করে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ হল।

অল্পদিনের মধ্যেই বাবার এই প্রতিষ্ঠান—"ইউ রায় এণ্ড সন্স্" আমাদের দেশে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান বলে বিখ্যাত হ'ল। এ বিষয়ে গবেষণা করে বাবা হাফ্‌টোন ছবি সম্বন্ধে কতগুলি নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন এবং সেগুলি বিলেতে কোনও প্রসিদ্ধ কাগজে প্রকাশ করে ওদেশেও অনেক প্রশংসা পেলেন। দাদা বড় হয়ে যখন বিলেতে গিয়েছিলেন, তখন দেখেছিলেন, লণ্ডনের কোনও প্রসিদ্ধ স্টুডিয়োতে বাবার পরিকল্পিত যন্ত্র দিয়ে তাঁর উদ্ভাবিত প্রণালীতে কাজ হচ্ছে।

এই সব কাজ নিয়ে যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, বাবা তাঁর সবচেয়ে

প্রিয় কাজ ছবি আঁকা ও গানবাজনা কোনোদিনই ভোলেন নি। ছোট্টবেলার ঝাপ্‌সা স্মৃতির মধ্যেও বাবার দুটি মূর্তি মনে জাগে: রং তুলি নিয়ে বাবা ছবি আঁকছেন আর বাবা বেহালা বাজাচ্ছেন। কি সুন্দর কত রকমের ছবির পর ছবিই যে তিনি আঁকতেন। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকতে তাঁর সমকক্ষ খুব কমই দেখতে পাওয়া যেত।

আমাদেরও বাবা ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতে উৎসাহ দিতেন। আঁকবার সরঞ্জাম এনে দিতেন, আমরা নিজেদের মনের মতন যার যা ইচ্ছা ছবি আঁকতাম, বাবা দেখে যেটুকু ভাল হয়েছে তার প্রশংসা করতেন, আর দোষ ত্রুটি যা থাকত তাও সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন। দিদি, দাদা আর টুনীর ছবি আঁকার হাত খুব সুন্দর ছিল। দিদি ফুল-পাতা, পাখি, গাছপালা ইত্যাদি সুন্দর জিনিষের ছবি আঁকতে ভালবাসত, আর দাদার প্রধান ঝোঁক ছিল মজার ছবির উপর। দাদার বই খাতা কত মজার মজার ছবিতে ভরা থাকত, পড়ার বইয়ের সাদা-কালো ছবিগুলি সব রঙ্গীন হয়ে যেত।

একবার আমরা তিনজনে টবে ফুলগাছ লাগালাম। দিদি আর সুরমামাসীর গাছে কি সুন্দর নীল রঙ্গের ফুল ফুটল, আর আমার গাছে সাদা কুঁড়ি ধরল দেখে আমার ভারি দুঃখ হল। পরদিন সকালে উঠে দেখি, আমার গাছে ওদের চেয়েও সুন্দর নানা রঙ্গের ফুল ফুটেছে। আমার তো আনন্দ ধরে না। অনেকক্ষণ পরে মেজেতে রঙ্গের ছিটা দেখে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম যে, ওগুলো আসলে রঙ্গীন ফুল নয়, কোন ভোরে উঠে দাদা রং তুলি নিয়ে আমার সাদা ফুলগুলোকে রঙ্গিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

নানারকম বাজনা বাবা ভাল বাজাতে পারতেন। সেতার, পাখোয়াজ, হার্মোনিয়াম, বাঁশী, বেহালা। তার মধ্যে বেহালা তাঁর

যেমন প্রিয় ছিল, বেহালার হাতও ছিল তাঁর তেমনি অসাধারণ। বেহালাখানি হাতে তুলে নিলে তিনি আর সব ভুলে গিয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে বাজিয়ে চলতেন, লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনত। একবার দিদির খুব অসুখ হয়েছিল। যন্ত্রণায় কিছুতেই ঘুম হত না, ঘুমের ওষুধেও কাজ হত না। কিন্তু বাবা যখন পাশে বসে বেহালা বাজাতেন তখন সে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। চিরজীবন বেহালাখানি তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। শেষ জীবনে রোগশয্যায়ও প্রতিদিন উঠে বসে বেহালা বাজাতেন, বাজাতে বাজাতে রোগযন্ত্রণা সংসারের নানা ভাবনা চিন্তা সমস্ত ভুলে যেতেন।

ছবি আঁকা ও গান বাজনার ঝোঁক নাকি বাবার ছেলেবেলা থেকেই ছিল। যখন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পড়তেন, একদিন বাংলার ছোটলাট তাঁদের স্কুল দেখতে এলেন। বাবাদের ক্লাসে ঢুকে সাহেব হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, বাবা মাথা নীচু করে একমনে খাতা পেন্সিল নিয়ে কি করছেন। চট্ করে খাতাটা চেয়ে নিয়ে দেখলেন যে, এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাবা সাহেবের বেশ সুন্দর একটা ছবি এঁকে ফেলেছেন। শিক্ষকমশাইরা তো ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, না জানি সাহেব কি মনে করবেন! সাহেব কিন্তু ভারি খুশী হয়ে বাবার পিঠ চাপড়ে বললেন, "এ জিনিসের চর্চা তুমি কখনও ছেড়ো না, বড় হয়ে তুমি এই লাইনেই যেয়ো।"

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অল্প আগে নতুন বেহালা কিনে বাবা তাই নিয়েই ভুলে রইলেন, পড়াশোনার দিকে একেবারেই খেয়াল রইল না। শেষে প্রধান শিক্ষকমশাই একদিন তাঁকে ডেকে নিয়ে বললেন, "তোমার উপর আমরা অনেক আশা রাখি, তুমি আমাদের নিরাশ করো না।" সেই দিনই বাড়ি এসে সাধের বেহালাখানি ভেঙ্গে ফেলে বাবা পড়ায় মন দিলেন।

প্রথম বিভাগে পাশ করে বৃত্তি পেয়ে তিনি কলকাতায় পড়তে এলেন এবং যথাসময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে বেরলেন। কলেজে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সহপাঠী ছিলেন। বাবার কাছে শুনেছি, আশুতোষের 'নোট্‌স্‌' এমন চমৎকার ছিল যে, তার জন্য ছেলেরা তাঁকে ভারি জ্বালাতন করত। ক্রমাগত চেয়ে নিয়ে যেত, তাঁর নিজের দরকারের সময় তিনি পেতেন না, তাই চুপিচুপি বাবার কাছে তিনি নোটের খাতা রেখে দিয়ে বলতেন, "তুমি তো এ সব পড় না বলেই সবাই জানে, তোমার কাছে থাকলে কেউ খোঁজ পাবে না।" বাস্তবিক কলেজের পড়ার বইয়ের চেয়ে গান বাজনা ও ছবি আঁকার দিকেই বাবার বেশী ঝোঁক ছিল। কলকাতায় এসে সে সব চর্চার সুযোগও তিনি পেলেন।

ভাল ওস্তাদের কাছে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতেন, ব্রহ্ম-সঙ্গীত তাঁর অতি প্রিয় ছিল। তিনি নিজেও কতগুলি সুন্দর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। আজও তাঁর "জাগো পুরবাসি।" গানটি দিয়ে প্রতি বৎসর আমাদের মন্দিরে মাঘোৎসবের উপাসনা আরম্ভ হয়, খৃস্টানদের ধর্মোৎসবেও এই গানটি হতে শুনেছি। ছোটদের জন্যও তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর গান লিখে গিয়েছেন।

বড় বড় সভা-সমিতি ও সঙ্গীত-সম্মেলনে যেমন তাঁর গান বাজনার আদর ছিল, তেমনি ছোটখাটো নানা অনুষ্ঠানেও তাঁকে অনুরোধ করে কেউ কোনোদিন নিরাশ হত না। গান বাজনায় নিজে যেমন আনন্দ পেতেন, গান বাজনা শোনাতে আর শেখাতেও তাঁর তেমনি আনন্দ ছিল। এ বিষয়ে কখনও তাঁর ক্লান্তি-বিরক্তি ছিল না।

আমাদের রোজ নিয়মমত বাবা গান বাজনা শেখাতেন, তাছাড়া কত যে তাঁর ছাত্রছাত্রী এসে জুটতো! তার উপরে ছিল মন্দিরে উৎসবের গান, স্কুলের প্রাইজের গান, কত বিয়ে ও সভা-সমিতির গান।

একেক সময়ে বাড়িটাই যেন গানের স্কুল হয়ে যেত। বেশ মনে পড়ে, শীতকাল সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় খেয়ে আমরা লেপের মধ্যে শুয়ে পড়েছি। ওদিকে পড়বার ঘরে তখন অনেক লোক জড়ো হয়ে কংগ্রেসের গান রিহার্সল দিচ্ছে। —'চল রে চল সবে ভারতসন্তান'। সঙ্গে অর্গ্যান বাজছে, বেহালা বাজছে, সারা বাড়িটা যেন গমগম করছে। বিছানায় শুয়ে 'এক মন্ত্রে কর জপ, এক তন্ত্রে তপ' শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, কতরাত অবধি গান চলেছে, কিছুই জানি না।

গান শিখতে কিম্বা ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে কত বিচিত্র রকমের লোককে তাঁর কাছে আসতে দেখা যেত। আমেরিকান যুবক, মেঘমন্দ্র গম্ভীর স্বরে গাইছেন—'প্রো-ভা-টে বি-ম-লো আ-ন-ন্-ডে'। (প্রভাতে বিমল আনন্দে)। কিম্বা মধ্যবয়েসী সিকিমি ভদ্রলোক, মিহি মোলায়েম গলা, সুরটাও ধরেছেন ঠিক, কিন্তু 'তা-তা থৈ-থৈ' কিছুতেই মুখে আসছে না। 'তা-তা তৈ-তৈ', 'দা-দা দৈ-দৈ' কতরকমই যে হচ্ছে।

'ছেলেদের রামায়ণ' আর 'ছেলেদের মহাভারত' বাবা আগে লিখেছিলেন। এবার একে একে 'মহাভারতের গল্প', 'ছোট্ট রামায়ণ' 'টুনটুনির বই', 'সেকালের কথা' ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর বই তিনি ছোটদের জন্য লিখলেন। এই সব বইএব চমৎকার ছবিগুলিও সব তাঁর নিজের আঁকা। বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন, বাবা তাঁদের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন।

ছোট ছেলেমেয়েদের বাবা বড় ভালবাসতেন। শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতই আনন্দে তিনি হাসি-খেলা নাচ-গানে মেতে উঠতেন। ছোটদের ভালবাসতেন, তাদের মন বুঝতেন বলেই বুঝি এমন সুন্দর সহজ মিষ্টি হত তাঁর লেখা।

বাবার মতন মিষ্টি কথাবার্তা খুব কম লোকের মুখেই শুনেছি।

ছোটবড় সকলের সঙ্গেই সমান মিষ্টি ও ভদ্র ছিল তাঁর ব্যবহার। কাউকে অভদ্রতা করতে দেখলে বেশ চমৎকার করে তাকে ভদ্রতা শেখাতেন।

একবার কি কাজে পোস্টাফিসে গিয়েছেন, পোস্টমাস্টারটির যেমন ঢিলেঢালা কাজ, তেমনি তিরিক্ষি তাঁর মেজাজ। সামান্য কাজে এত দেরি করছেন যে, লোক ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছে। বাবা খুব ভদ্রভাবে তাঁর কাজটির জন্য অনুরোধ করতেই ভদ্রলোক একেবারে খিঁচিয়ে উঠলেন—"দেখছেন তো মশাই কাজ করছি, আমার কি চারটে হাত?" শান্ত স্বরে বাবা বললেন, "কি জানি মশাই, বয়েস তো হয়েছে, অনেক দেশে ঘুরেছিও, কিন্তু চারটে হাতওয়ালা পোস্টমাস্টার তো কখনও কোথাও দেখিনি। তবে দুটো হাত দিয়েই তাঁরা অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করেন।" আশপাশের লোক সবাই হেসে উঠল আর পোস্টমাস্টাবও লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি কাজটি সেরে দিলেন।

আরেকটি ঘটনা বলি। নিমন্ত্রণ-বাড়িতে বামুনঠাকুররা পরিবেশন করছে, বাড়ির কর্তা দাঁড়িয়ে তদারক করছেন। গণ্যমান্য লোকদের খুব আদর আপ্যায়ন হচ্ছে, কিন্তু নিমন্ত্রিত গরীব ভদ্রলোকদের কেউ যত্ন আদর করছে না। "গরম লুচি! গরম লুচি!" হাঁক শুনে একজন বললেন, "ঠাকুর, আমাকে দুখানা গরম লুচি দাও তো?" কর্তা অমনি ব'লে উঠলেন, "তা ব'লে পাতের ঠাণ্ডা লুচিগুলো ফেলে দেবেন না যেন!" তারপরেই বাবার কাছে এসে খাতির করে বললেন, "আপনাকে দুখানা গরম লুচি দিক?" বাবা অত্যন্ত বিনীতভাবে উত্তর দিলেন—"কিন্তু আমার পাতের ঠাণ্ডা লুচি তো ফুরোয়নি?" তখন গৃহকর্তা লজ্জা পেয়ে সেই ভদ্রলোককে এবং সবাইকেই সমান যত্ন করে খাওয়ালেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ছোট্টবেলায় কবে দার্জিলিং গিয়েছিলাম আমার কিছুই মনে ছিল না। দাদা-দিদিরা গল্প করত, আর আমি শুনতাম। এবার গরমের ছুটিতে দার্জিলিং যাওয়া হবে শুনে আমার খুব আনন্দ হল। এবার নমাসীও আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে যখন ট্রেন ছাড়ল,—মাসী গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল; বাবা কতবার বসতে বললেন, সে গ্রাহ্যই করল না। খুব জোরে বাতাস বইছে,—মাসীর বব্-করা চুল হাওয়ায় উড়ছে, হঠাৎ র‍্যাকের উপর থেকে বাবার টুপিটা দমকা হাওয়ায় উড়ে জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেল। যাবার সময় মাসীর মাথায় জোরসে এক থাপ্পড় কসিয়ে দিয়ে গেল! "কে রে?" বলে মাসী চমকে চেঁচিয়ে উঠল, আমরা তো হেসেই কুটিপাটি। "বেশ হয়েছে। যেমন বাবার কথা শুনছিলে না তেমনি শাস্তি হয়েছে।"

পঞ্চাশ বছরেরও আগেকার কথা। সারা-ব্রীজ তখন হয়নি, সারাঘাট থেকে দামুকদিয়াঘাট খেয়া-জাহাজে পার হয়ে ওপারের ট্রেন ধরতে হত। শিলিগুড়িতে আমাদের চেনা এক পরিবার ছিলেন, তাঁরা স্টেশনে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে পোলাও কালিয়া কাটলেট অনেক কিছু এনেছিলেন, বেশ ভোজ হল। তারপর পাহাড়ের লাইনের ছোট্ট গাড়িতে চড়ে বসা গেল। ট্রেনে যেতে অনেক সময় লাগে বলে আজকাল অনেকে মোটরে শিলিগুড়ি থেকে চলে যান। ইদানীং প্লেনে

যাবার ব্যবস্থাও হয়েছে। তখন তো প্লেন বা মোটর ছিল না, ট্রেনও খুব আস্তে আস্তে চলত। তাতে কিন্তু একটা সুবিধা ছিল। চারদিকের দৃশ্য ভাল করে দেখবার অবসর পাওয়া যেত।

ছোট লাইনের ছোট্ট গাড়ি আস্তে আস্তে উপরে উঠছে। দু পাশে ঘন বন, গাছপালা ভিড় করে গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করে আছে, আকাশে উঁকি দেবার চেষ্টায় ঠেলাঠেলি করে মাথা তুলছে। ফাঁকা জায়গায় যে সব গাছ অনেক ডালপালা ছড়িয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে, এখানে হাত পা মেলবার জায়গা না পেয়ে রোদ বাতাস

পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে গাড়ি চলেছে

পাবার জন্য খালি লম্বা হয়ে উপর দিকেই বেড়ে চলেছে। গাছের গায়ে গায়ে প্রকাণ্ড লতা জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে, ডালে ডালে সবুজ 'মস' (moss) মালার মত ঝুলছে, কলাগাছের মত বড় বড় 'ট্রি ফার্ন' গাছ সুন্দর পাতা মেলে দলে দলে দাঁড়িয়ে আছে। বনের ভিতরটা আবছায়া অন্ধকার মত, কেমন একটা ভ্যাপসা, স্যাঁৎসেতে গন্ধ।

পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে লাইন চলেছে—'লুপ'-এর মধ্যে পাক খেয়ে জিগজ্যাগ-এ এগিয়ে পিছিয়ে, কত কায়দা করে অল্প জায়গার

মধ্যে অনেকখানি উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে যখন পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে নীচের সমতল ভূমি দেখা যাচ্ছে,—ঠিক যেন সুন্দর একখানা রঙীন রিলিফ ম্যাপ কেউ বিছিয়ে রেখেছে,—তখন বোঝা যাচ্ছে কতখানি উঁচুতে আমরা উঠেছি। একেবারে মেঘের উপরে উঠে গিয়েছি; মাথার উপরে রোদ, পায়ের নীচে পাহাড়ের কোলে মেঘ, সেই মেঘের উপরে সূর্যের আলো পড়ে রামধনু পাহাড়ের গা বেয়ে আকাশে উঠে গিয়েছে। কি চমৎকার যে লাগছে দেখতে! তারপর যখন একটা মোড় ঘুরেই বরফ-ঢাকা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' প্রথম চোখে পড়ে, কি আশ্চর্য সুন্দর লাগে দেখতে।

কত সুন্দর সুন্দর ঝরনা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে; সবচেয়ে বড় যে পাগলাঝোরা, সে প্রতি বৎসর বর্ষাকালে একেবারে পাগলা হয়ে গিয়ে রাস্তা, রেল লাইন সব ভেঙে দিত, তাই তাকে বেঁধে জলের ধারাকে দুই-তিন ভাগ করে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আর তার আগের মত তেজ নেই। স্টেশনে ট্রেন থামলেই পাহাড়ি মেয়েরা হাসিমুখে সুন্দর সুন্দর অর্কিড, পাতার ঠোঙায় করে পাকা গুজবেরী ফল বিক্রী করতে আনছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা "বক্‌শিশ! সাব, বক্‌শিশ!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে—খাঁদাবোঁচা মুখ, কুৎকুতে চোখ, গাল দুটি আপেলের মত লাল।

ঘুম স্টেশনে গাড়ি থামতেই 'ঘুম-বুড়ি' এসে ফোকলা মুখে একগাল হেসে দাঁড়াল। দু হাত পেতে বেড়ালছানার মত সরু গলায় বলল, "বা-বু পোইসা?" বুড়ির যে কত বয়েস কেউ জানে না। কেউ বলে, আশি-নব্বই; কেউ বলে, একশো-দেড়শো। একটিও দাঁত নেই, মুখের চামড়া কুঁচকে আমসির মত হয়ে গিয়েছে। ছোট ছোট পিটপিটে চোখ দুটি হাসলে পরে একেবারে বুজে মিলিয়ে যায়। সাহেবরা ওর নাম কেন যে 'ঘুমডাইনী' (উইচ অভ্‌ ঘুম) রেখেছিল

জানি না। শিশুর মত সরল ওর মুখখানি দেখলেই ভাল লাগে, সকলেই খুশি হয়ে ওকে ভিক্ষা দেয়। ও আগে কোথায় থাকত, কি করত, কেউ জানে না। রেল লাইন তৈরী হয়ে অবধি ও এই স্টেশনে ভিক্ষা করছে, আর এই বিশ-পঁচিশ বছর ধরে ওর চেহারা নাকি ঠিক ঐ একরকমই রয়েছে। কয়েক বৎসর পরে ঘুম-বুড়ি যখন মারা গেল তখন ওর সারাজীবন ভিক্ষা করে সঞ্চিত দশ-বারো হাজার টাকা গরিবদের বাসোপযোগী একটা ধর্মশালা তৈরী করবার জন্যে দান করে গিয়েছিল।

ঘুমের পরেই দার্জিলিং। স্টেশনে পৌঁছবার আগেই রাস্তার ধারে একটা বাড়ির গেটে দেখি সুবালামাসী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, বুঝলাম এটাই আমাদের বাড়ি। ওঁদের বাড়ির পাশেই, ওঁরাই আমাদের জন্য বাড়ি ঠিক করে রেখেছিলেন। স্টেশনে কুলীরা দেখি সবাই মেয়ে। একটি অল্পবয়েসী মেয়ে একটা মস্ত ট্রাঙ্ক ধরে টানাটানি করছে দেখে সুরমামাসী বলল, "এত বড় ট্রাঙ্ক কি তুমি একলা নিতে পারবে?" মেয়েটি এক হ্যাঁচকা টানে বাক্সটা পিঠে তুলে হেসে বলল, "এর উপরে আরেকটা চাপিয়ে দাও।" কি শক্ত এই পাহাড়ি মেয়েরা! বড় বড় বাক্স-বিছানা পিঠে তুলে কপালের সঙ্গে একটা চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে নিয়ে কেমন অনায়াসে পাহাড়ে ওঠানামা করে।

ওদেশে দোকান-বাজারেও দেখলাম বেশীর ভাগই মেয়েরা বিক্রী করছে। তাদের মধ্যে অনেকেরই গায়ে মোটা মোটা সোনা-রূপোর গহনা-পরা। অনেকে বিশেষত নেপালী মেয়েরা বেশ সুন্দর দেখতে। গরিব লোকেরা অত্যন্ত নোংরা। শীতের দেশ, স্নান করতেই চায় না। তাছাড়া গরম জামা-কাপড় তো বেশী জোটে না, একসেট যা থাকে, তা-ও ক্রমে ময়লা তেলচিটচিটে ও দুর্গন্ধ হয়ে যায়! তবে সুন্দরই হোক আর খাঁদাবোঁচাই হোক, পরিষ্কার হোক কি নোংরাই

হোক, সকলেরই বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ চেহারা আর মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ছবির মত শহরটি। চারদিকের দৃশ্য কি চমৎকার। সবচেয়ে দেখবার জিনিস বরফের পাহাড়। ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলায়,—ধবধবে সাদার উপর গোলাপী সোনালী রূপালী, কত রংই না খেলে যায়। আর সুন্দর লাগে, মেঘ ও কুয়াশার খেলা দেখতে। সকালে উঠে দেখি, রাশি রাশি পেঁজা তুলোর মত মেঘ পাহাড়ের কোলে যেন ঘুমিয়ে আছে, রোদ উঠলে পরে তারা আস্তে আস্তে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে থেকে উপরে উঠতে লাগল, ঘন কুয়াশার মত চারদিক ছেয়ে ফেলল। গাছপালা, ঘর বাড়ি, সব ঢাকা পড়ে গিয়েছে, কয়েক হাত দূরে আর কিছুই দেখা যায় না। আবার আস্তে আস্তে 'মিস্ট' কেটে গিয়ে চারদিক পরিষ্কার দেখা গেল ; নাকে, মুখে, চুলে, কাপড়ে বিন্দু বিন্দু জলের কণা লাগিয়ে দিয়ে গেল।

গাছপালা সব কেমন নতুন ধরনের। বীচ, বার্চ, রডডেনড্রন, পাইন, ফার প্রভৃতি কত গাছ। যে সব বিলিতি ফুলের এতদিন শুধু নামই শুনেছিলাম আর বইয়ের পাতায় ছবি দেখেছিলাম, এখানে তাদের গাছে ফুটে থাকতে দেখে কত আনন্দ হল। কি সুন্দর ফুল! বাগান যেন আলো করে আছে। বড় বড় ঝাউগাছের গা বেয়ে গোলাপের লতা চূড়ো পর্যন্ত উঠে গিয়েছে আর ফুলে একেবারে ভরে রয়েছে—ঠিক যেন গাছটিকে কেউ ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে।

রোজ দল বেঁধে বেড়াতে বেরোতাম। বাবা যখন ছবি আঁকতেন, তখন মেসোমশাইর (ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য) সঙ্গে বেরোতাম। ম্যাল্, বার্চহিল, অবজার্ভেটরি হিল, বট্যানিক্যাল গার্ডেনস ইত্যাদি প্রায়ই বেড়াতাম। ম্যাল্-এর দিকে তখন এত ঘোড়সওয়ারের ভিড় ছিল না। একজন বেঁটে মোটা সাহেব একটা বেঁটে খাটো হাঁড়িমুখো

বুলডগ নিয়ে রোজ ম্যালে বেড়াতে আসতেন, আর একজন অল্পবয়েসী বাঙালী সাহেব আনতেন একটা প্রকাণ্ড বোর্ হাউণ্ড। কুকুর ত নয়, যেন একটা বাঘ! দুটো কুকুর পরস্পরকে দেখলেই দাঁত খিঁচিয়ে গরগর করত। দুই মনিবও একটু নাক তুলে পরস্পরের দিকে আড়-চোখে চেয়ে চলে যেতেন। হঠাৎ একদিন ম্যাল্-এর মাঝখানে দুই কুকুরে ভীষণ লড়াই বেঁধে গেল। একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড! চারদিকে ভিড় জমে গেল। কেউ বলে, 'এমনি করে ধরো'; কেউ বাতলায়, 'ওদিক দিয়ে টান মারো'। কিছুতেই আর সে মরণ-

...একটা বেঁটেখাটো হাঁড়িমুখো বুলডগ...একটা প্রকাণ্ড বোর হাউণ্ড...
হঠাৎ একদিন ম্যাল্-এর মাঝখানে দুই কুকুরে ভীষণ লড়াই...

কামড় ছাড়ান যায় না। এদিকে ভিড়ের মধ্যে তর্ক বেধেছে, কার দোষ? কে আগে লেগেছে?—বাজিধরাও চলেছে, কোন্ কুকুর জিতবে? অনেক কাণ্ড করে তো দুই কুকুরকে ছাড়ান গেল, দুই মনিব পরস্পরকে শাসিয়ে যে যার কুকুর নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। পরদিন দেখা গেল, বুলডগ ভ্রূর উপরে একটা তাপ্পি লাগিয়ে, বোঁচা লেজ নেড়ে, দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বাঘা কুকুরের আর দশ-বারো দিন ধরে পাত্তাই পাওয়া গেল না।

আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগত নির্জন রাস্তায় লম্বা পাড়ি দেওয়া। রাস্তা ঢালু দেখলেই মেসোমশাই হাঁকতেন, "দড়্-কে" আর আমরা ছেলেবুড়ো সবাই মিলে হুড়্মুড়িয়ে রেস্ দিতাম। জালাপাহাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে ঘুম পর্যন্ত গিয়ে ট্রেনে ফিরে আসা আর ব্লুম্‌ফিল্ড-এর মাঠে গিয়ে ছুটোছুটি করা আমাদের খুব পছন্দ ছিল। ব্লুম্‌ফিল্ড-এর মাঠটা মস্ত বড়। সেখানে মেসোমশাই ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে বিশ্রাম করতেন, তাঁকে 'বুড়ি' বানিয়ে আমরা চোর-চোর খেলতাম। 'বুড়ি' ছোঁয়ার ধাক্কায় একেকদিন 'বুড়ি' চিৎপটাং হয়ে যেতেন।

আমরা হুড়োহুড়ি খেলতাম, দিদি আর সুরমামাসী ততক্ষণ ঝোপঝাড় থেকে বনফুল, ফার্ন ইত্যাদি সংগ্রহ করত। পরে আরো কয়েকবার দার্জিলিং গিয়েছি, তখন শহরের অনেক উন্নতি হয়েছে, অনেক নতুন ঘরবাড়ি তৈরী হয়েছে, সে সব বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল। কিন্তু আগে যেমন আনাচে কানাচে কত রকমের সুন্দর সুন্দর বনফুল —উড্ ভায়োলেট, ওয়াইল্ড প্যান্সি; কত অর্কিড্—গোল্ডেন ফার্ন, সিলভার ফার্ন, ইত্যাদি পেতাম সেরকম আর পাইনি।

নীচের বস্তি থেকে গোয়ালারা বাঁশের চোঙায় করে দুধ বেচতে আনত। এত সুন্দর সে দুধ যে আসতে আসতে পথের ঝাঁকানিতেই মাখন ভেসে উঠত। জ্বাল দিলেই চমৎকার পুরু সর পড়ত। একটু ফেটালেই সেই সর থেকে সুন্দর হলদে মাখন বেরোত। ঘরে তৈরী সেই টাট্‌কা মাখন খেতে আমরা খুব ভালবাসতাম। শাকতরকারীই বা কতরকমের, আর কি সুন্দর!

সেখানকার জলহাওয়ার গুণে আর অত বেড়াতাম বলে খিদেও পেত খুব, কিন্তু খাওয়ার সময়েই বাধল বিপদ! বাবার শরীরটা খারাপ ছিল, মা এ সময়ে তাঁর খাওয়া-দাওয়া নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকতেন, আমরা ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেতে বসতাম।—মাসী ছিল,

যাকে বলে 'স্টাইলিশ'! সে এই সুযোগে আমাদের কায়দাত্বরস্ত করে তুলবার জন্য উঠে-পড়ে লাগল। "এমন করে বসবে না, অমন করে খাবে না, হেন করবে না, তেন করবে না"—কড়া শাসন আরম্ভ হল। মহামুশকিল। বিশেষত,—মাসী তো আমাদের চেয়ে সামান্যই বড়, তার সর্দারিটা বরদাস্ত হয় না। শেষটায় দাদা বিদ্রোহ করল। অত্যন্ত বোকার মত মুখ করে, হাঁ করে কুঁজো হয়ে এসে বসল, ত্বই হাতে মুঠো করে কাঁটা-চামচ খাড়া করে ধরে, খটাখট্ শব্দে খেতে আরম্ভ করল; তাড়া খেয়ে, অতি সন্তর্পণে কাঁটা-চামচ ঠিক করে ধরতে গিয়ে, 'কি যেন কি করে' হাত-ফস্‌কে চামচ-কাঁটা এদিক ওদিক ছিট্‌কে পড়ে গেল। সোজা হয়ে বসতে বলাতে, চেয়ারের ত্বই হাতলে ভর করে আস্তে আস্তে কষ্টেসৃষ্টে খাড়া হওয়ামাত্রই হঠাৎ 'কেমন করে যেন' পিছলে শরীরটা সড়াৎ করে টেবিলের নীচে চলে গেল আর চিবুকটা ঠকাস্ করে টেবিলে ঠুকে গেল।—মাসী যতই ধমক্‌চমক করে, দাদা ততই হাঁদার মত মুখ করে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়—কতই যেন ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গিয়েছে আর প্রাণপণ চেষ্টা করবার ভান করে অদ্ভুত আনাড়ি-পণা দেখায়। তিক্ত-বিরক্ত হয়ে মাসী আমাদের 'স্টাইলিশ' করবার চেষ্টা ছেড়ে দিল, আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ভূতের ভয়টা ওদেশে খুব আছে। রাত্রে কেউ সহজে ঘরের বার হতে চায় না। ওখানে যেমন হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে, বৌদ্ধ গোম্‌পা-ও আছে। পথেঘাটে বৌদ্ধ লামা দেখতে পাওয়া যায়, তাদের হাতে একটা ঝুমঝুমির মত দেখতে জিনিস (প্রেয়ার হুইল) তার মধ্যে "ওম্ মণিপদ্‌মে হুম্" ইত্যাদি মন্ত্র লেখা থাকে, যন্ত্রটা ঘুরিয়ে মন্ত্র জপ্ করা হয়। আবার এখানে-সেখানে বাঁশের ঝাণ্ডার গায়ে রাশি রাশি কাগজ ও কাপড়ের টুকরো ঝোলান থাকে। ঐ সব টুকরোতে নাকি ভূতের উপদ্রব ও অমঙ্গল দূর করবার মন্ত্র লেখা থাকে।

আমাদের বাড়িটা ছিল কার্ট রোডের উপরে। সামনেই রেলের লাইন, দুপুরবেলায় ট্রেন আসবার সময় গেটের পাশের বেঞ্চে গিয়ে আমরা বসতাম। প্রায় প্রতিদিনই দেখতে পেতাম চেনা কেউ-না-কেউ এল।

হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এল—ধন-খুড়িমার খুব অসুখ, অবস্থা খারাপ। রাতারাতি প্যাক করা শেষ করে পরদিন সকালের গাড়িতেই আমরা চলে এলাম। কয়েকদিন পরে খুড়িমা মারা গেলেন, তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে ধনকাকা আমাদের বাড়িতে চলে এলেন। এতদিন আমরা বাড়িতে সাতজন ছেলেমেয়ে ছিলাম, এবার দশজন হলাম!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এই দশটি ছেলেমেয়েকে বুকে করে, স্নেহ মমতা, সেবা দিয়ে ঘিরে মানুষ করেছিলেন আমাদের মা। শুধু নিজের পরিবারেই নয়, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শী, যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসত, সকলকেই তিনি সহজে আপনার করে নিতেন। মাকে দেখতাম, সারাদিন কাজে ব্যস্ত—যেন তাঁর নিজের আরাম বা বিশ্রাম বলে কিছু নেই। বাড়ির সমস্ত কাজ দেখাশোনা করা, সকলের সেবাযত্ন করা, বাইরে সকলের খোঁজখবর নেওয়া, কার অসুখ, কার কি অভাব, কার কিসে সাহায্য দরকার, সব দিকেই তাঁর খেয়াল থাকত। কতবার দেখেছি, কারো হয়তো অসুখ, কিছু খেতে পারছে না শুনে মা নানারকম সহজ সুস্বাদু খাবার নিজের হাতে তৈরী করে পাল্কি করে নিয়ে গিয়ে সামনে বসে খাইয়ে আসতেন।

একবার বিদেশে চেঞ্জে গিয়েছি। নতুন জায়গায় পৌঁছে সবাই ব্যস্ত। এত ব্যস্ততার মধ্যেও দূরে কোথায় ছোট ছেলের ক্ষীণ কান্না মা'র কান এড়ায়নি। খোঁজ নিয়ে জানলেন, মস্ত কম্পাউণ্ডের একাপ্রান্তে আউট-হাউসে মালীর ছোট্ট ছেলেটা পেটের অসুখে ভুগছে। মালী-বৌ ছেলে সামলাতে পারে না, যত্নটত্ন কিছুই জানে না। ভুগে ভুগে ছেলেটা হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছে। এত কাজের উপর মা'র আরেক কাজ বাড়ল, রোজ চার-পাঁচবার করে দুধ বার্লি নিয়ে গিয়ে বাচ্চাকে খাওয়ানো, তাকে ওষুধ দেওয়া আর তার মাকে ছেলের যত্ন

নিতে শেখানো। অল্প দিনের মধ্যেই সে ছেলের এতদিনের অসুখ ভাল হয়ে গেল।

দেশ থেকে আমাদের এক দূরসম্পর্কের ভাই এল। অনেকদিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগছে, কিছুতেই সারে না, তাই তার বাবা মা আমাদের বাবা মায়ের কাছে তাকে রেখে গেলেন চিকিৎসার জন্য। ভয়ানক রোগা, কিছুই হজম হয় না। ওদিকে আবার লুকিয়ে লুকিয়ে কেরোসিন, তেল, মাটি ইত্যাদি অদ্ভুত জিনিস খায়; কবিরাজ বললেন, এ অসুখ সারতে সময় নেবে, আর খুব সাবধানে এবং নিয়মে থাকতে হবে। কত রকমের ওষুধপথ্য, আর সে সব তৈরী করাও কি কম হাঙ্গামা! মা নিজে সে সমস্ত করতেন, কত করে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে 'পোড়ের ভাত' আর কত কি সব 'মণ্ড' ইত্যাদি পথ্য খাওয়াতেন আর সব সময়ে চোখ রাখতেন, যাতে লুকিয়ে যা তা না খায়। কয়েক মাসের মধ্যে সে ভাল হয়ে উঠল, আমাদের সঙ্গে চেঞ্জে গেল, তাবপর দেশে ফিরে যাবার সময় মাকে ছেড়ে যেতে তার কী কান্না!

আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করত, মা তাদের পরিবারের লোকের মতই স্নেহ যত্ন করতেন। তারাও তেমনি তাঁর অনুগত ছিল। আমাদের 'বামুনদিদি', 'তুতুর ঝি', প্রয়াগ (বেয়ারা), কামিনী (জমাদারনী)—ছোটবেলা থেকেই এদের আমরা দেখে এসেছি। জোয়ান বয়েসে এরা আমাদের বাড়িতে এসেছিল, আর যতদিন খাটবার শক্তি ছিল, ততদিন আমাদের ছেড়ে কোথাও যায়নি। সাধ্যমত আমাদের সেবা করেছে, ছেলের মত আহ্লাদ আবদার করেছে, বুড়ো হয়ে দেশে চলে গেলেও মা ওদের খবর রেখেছেন আর দরকারমত সাহায্য করেছেন। ওদের কারো কারো ছেলে, বৌ, নাতি পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে কাজ করেছে।

মা একটা কথা বলতেন, "দিয়ো কিঞ্চিৎ, না করো বঞ্চিৎ।" অর্থাৎ ভাল জিনিস সবাইকে কিছু কিছু দিয়ো, কাউকে বঞ্চিত করো না। ঠাকুরদাদা নাকি ঠাকুরমাকে এই কথাটা সর্বদা বলতেন। মা'রও কথাটা খুব মনে ধরেছিল। তাঁকে যেমন মুখে একথা বলতে শুনতাম, কাজেও তাই করতে দেখতাম। কোনও ভাল জিনিস সবাইকে দিতে না পারলে তাঁর তৃপ্তি হত না।

মা খুব সুন্দর রান্না করতে আর নানারকম খাবার তৈরী করতে পারতেন। নতুন কোনো ভাল রান্না দেখলেই শিখে নিতেন, নিজের মন থেকেও কত রকম সুন্দর সুন্দর নতুন রান্না করতেন। কত রকম আচার, মোরব্বা, আমসত্ত্ব ইত্যাদি সারা বছর তৈরী করতেন, আর কার কোন্ আচারটা খুব পছন্দ, কার অরুচির জন্য জারকলেবু, কার অজীর্ণের জন্য বেলের মোরব্বা, এমনি করে কত লোককে দিতেন। নিজের হাতে রেঁধে সবাইকে খাওয়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন— বাড়িতে সর্বদাই বেশ একটা লোকজন খাওয়ানোর ধুম লেগে থাকত। এখনও কত জনের মুখে মায়ের হাতের রান্না ও আদর-যত্নের কথা শুনতে পাই। ডক্টর জে. টি. স্যাণ্ডারল্যাণ্ড ('ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ' নামে প্রসিদ্ধ বই যাঁর লেখা) একবার আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণে এসে মা'র রান্না খেয়ে বারবার বলেছিলেন, "আপনি আমাদের দেশে (আমেরিকা) এসে একটা রান্নার স্কুল খুলুন—আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, সে স্কুলের অত্যন্ত আদর আর খ্যাতি হবে।"

আমরা যেমন একটু বড় হলাম, মা আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘরের সব কাজ শেখাতেন। যারা একটু বড়, তাদের একটু কঠিন কাজ আর যারা ছোট, তাদের সহজ কাজ ভাগ করে দিতেন। মা বলতেন, "দশে মিলি করি কাজ—হারি-জিতি নাহি লাজ।" সবাই মিলে পাল্লা দিয়ে কাজ করতে বেশ খেলার মতই মজা লাগত। হয়তো খাবার

তৈরী করতে করতে কতগুলো পুতুলের খাবারের মত ছোট্ট ছোট্ট খাবার হল, ছোট্ট কড়ায় ছোট্ট ছোট্ট লুচি ভাজা হল, বড়ি দেবার সময় ছোট্ট একটা পাত্রে এত্তোটুকু ক্ষুদে ক্ষুদে বড়ি দেওয়া হল। বড়ি কারো থ্যাবড়া হচ্ছে, আর সবাই দেখে হাসছে। তখন মা একটা মজার গল্প বললেন: মা'রা যখন ছোটবেলায় বড়ি দিতে শিখতেন, মা'র দিদিমা বলে দিতেন, "যে মেয়ে যেমন বড়ি দেবে, তার বরের তেমনি নাক হবে।" পাছে বরের থ্যাবড়া নাক হয়, সেই ভয়ে সব মেয়েরা অতি যত্নে সুন্দর টিকলো বড়ি দিত। গান-বাজনা, ছবি-আঁকা ইত্যাদি আমি দাদা-দিদিদের মত ভাল পারতাম না, কিন্তু এই সব কাজ আমার খুব ভাল লাগত। খুব উৎসাহের সঙ্গে চটপট শিখতাম। আর দিদির ছিল আর্টিস্টের হাত; তাঁর হাতের সব কাজ পরিপাটি হত, সব জিনিসের গড়ন সুন্দর হত।

একদিন মা পিঠে তৈরী করছেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে শিখছি, এমন সময় একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এলেন। এঁর স্বামী মারা গিয়েছেন, ছেলেপিলে নিয়ে কষ্টে পড়েছেন, মা'র কাছে মাঝে মাঝে সাহায্যের জন্য আসতেন। খানিকক্ষণ বসে কথাবার্তার পর তিনি বাড়ি যাবার জন্য উঠছেন, মা তাঁকে একটু বসতে অনুরোধ করলেন। তিনি ইতস্তত করে বললেন, "চারটে বাজে, ছেলেদের স্কুল থেকে ফিরবার সময় হল—" বলতে বলতেই প্রয়াগের সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েরা এসে হাজির! এর মধ্যে কখন যে মা লোক পাঠিয়ে ওদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন, কেউ জানে না। আমরা দুই বাড়ির ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বসে আনন্দ করে খাচ্ছি, দুই মা হাসিমুখে চেয়ে দেখছেন। হঠাৎ সেই মহিলার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল। মাকে বললেন, "দিদি, আপনি কি ঠিক আমার মনের কথাটি বুঝতে পেরেছিলেন? পিঠে তৈরী দেখেই আমার মনটা কেমন করে উঠেছিল। কত কাল

ওদের হাতে এসব জিনিস দিতে পারিনি।"

মাঘোৎসবের শেষে প্রতি বৎসর শহরের বাইরে কোনও বাগানে 'উত্থান-সম্মিলন' হয়। একবার সম্মিলনে যিনি রান্নার চার্জে ছিলেন, তিনি বললেন, "এবার মেয়েরা কেউ রান্নার এদিকে আসতে পারবেন না! মেয়েরা সারা বছর সংসারের কাজ করেন, বেরোতে পারেন না, আজ তাঁরা শুধু বেড়াবেন—আমি ছেলেদের দিয়ে সব কাজ করাব।" প্রকাণ্ড বাগানে কয়েক শ' লোক জমা হয়েছে। সকালে গাছতলায় বসে উপাসনা, গান, কীর্তন ; তারপরে খেলাধূলা ও বেড়ানো, সারি সারি গাছতলায় বসে খিচুড়ি খাওয়া। পালা করে খাওয়া শেষ হতে হতে অনেক বেলা হয়ে গেল। যে যাঁর ছেলেপুলে সামলিয়ে বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন। মা আরো দুয়েকটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে রান্নাবাড়ির দিকে গেলেন ; ছেলেরা এত পরিশ্রম করে সবাইকে খাওয়াল, এবার ওঁরা তাদের খাওয়া দেখবেন। গিয়ে দেখেন, হায় কপাল! খিচুড়ি সব শেষ। চাল-ডালও নেই যে আবার চড়ানো হবে, কাছে দোকান-পাটও নেই যে কিনে আনবে, রান্নার ঠিকে-বামুনেরাও শেষ হাঁড়িটি নামিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেরা বলল, "তরকারি আছে, দৈ-মিষ্টি আছে, ওতেই হয়ে যাবে।" মা দেখলেন, কিছু ঘী আছে, ময়দাও কিছু রয়েছে, কিন্তু চাকি, বেলনা, কিছুই নেই। ছেলেদের বললেন, "তোমবা তো অনেকে সাইকেলে এসেছ, দুয়েকটা পাম্প নিয়ে এসো তো ?" ছেলেরা পাম্প এনে দিল, তাই দিয়ে পিঁড়ের উপর লুচি বেলে মা ওদের গরম লুচি খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

একবার দার্জিলিংয়ে মা'র 'হিল ডায়েরিয়া' হয়েছিল। বাবা-মা'র বন্ধু একজন ডাক্তারের চিকিৎসায় সেরে গেল। এক মাস ধরে ডাক্তারবাবু মাকে 'কাঁচকলা-ভাতে-ভাত' পথ্য করিয়েছিলেন। ভাল

হয়ে উঠে একদিন মা ডাক্তার-বন্ধুকে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। ভদ্রলোক এসে দেখেন, অনেক রকম রান্না হয়েছে, কিন্তু শুক্ত থেকে পায়েস পর্যন্ত, সবই কাঁচকলা! দেখে যত না অবাক হলেন, খেয়ে আরও অবাক হলেন—ভারি খুশী হয়ে বললেন, "কাঁচকলা থেকে যে এত রকমের সুখাদ্য তৈরী হতে পারে, আমার ধারণাই ছিল না!"
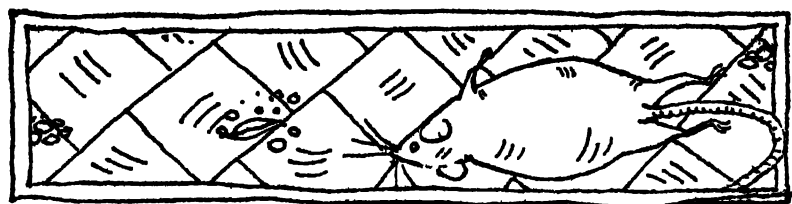
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাবেলা, মাস্টারমশাইর আসবার সময় হয়েছে, আমরা সবাই পড়ার টেবিল ঘিরে বসে অপেক্ষা করছি। সুরমামাসী আর দিদি একমনে বই পড়ছে। টুনী ঠোঁট ফুলিয়ে মুখ ভার করে বসে আছে—দাদা কি যেন বলে তাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। মনির দুষ্টুমি-ভরা চোখ দুটো চকচক করছে, দেখেই বোঝা যায় টুনীর রাগটা সে বেশ উপভোগ করছে। দাদা নিরীহ ভালমানুষটির মত বইয়ের উপর ঝুঁকে রয়েছে, টুনীর কি হয়েছে সে যেন কিছুই জানে না। হঠাৎ সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে দাদা বলল, "দেখ্ তো বুলু, মাস্টারমশাই আসছেন নাকি ?" তিন বছরের বুলু সিঁড়ির মাথা থেকে ঝুঁকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "না, মাস্তাল্‌মসাই না, শা-স্-তিমসাই।" সিঁড়ি দিয়ে যিনি উঠছিলেন তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন, "শাস্তিমশাই! সে কি রে? আমি কি তোদের শাস্তি দিই ?"

শাস্তি দূরের কথা, এই মানুষটি বাড়িতে এলেই আমাদের মনটা খুশী হয়ে উঠত। "শাস্ত্রীমশাই এসেছেন" শুনলেই আমরা যে যেখানে থাকতাম, কাছে গিয়ে জুটতাম। তিনি যে অমন সাধু, ভক্ত ও জ্ঞানী লোক, আমাদের ব্রাহ্মসমাজের নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ছোটবেলায় অতশত বুঝতাম না। চেহারাটাও তাঁর সুন্দর ছিল না, কিন্তু সেই চেহারার মধ্যে, চোখ পিটপিট করে সেই হাসির মধ্যে, কী একটা আকর্ষণ ছিল, যার জন্য ছোট্টবেলা থেকেই আমরা

তাঁর খুব ভক্ত ছিলাম। এমন কি দিদি, যে অমন শান্ত, সেও নাকি ছোট্টবেলায় শাস্ত্রীমশাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে তেড়ে ঝগড়া করত—"আমার শাস্ত্রী!"

শাস্ত্রীমশাই দাদামশাইয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁর মেয়ে হেমমাসীমা মা'র প্রিয়সখী ছিলেন, বাবা-মাকেও শাস্ত্রীমশাই খুব ভালবাসতেন। প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন।

আমাদের স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাস্ত্রীমশাই। স্কুলের প্রতিষ্ঠার দিনটি ছিল তাঁর জন্মদিন। সেদিন সকলে মিলে যেখানে বেড়াতে যাওয়া হত, শাস্ত্রীমশাইও আমাদের সঙ্গে যেতেন, আমাদের নিয়ে উপাসনা করতেন, আমাদের আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিতেন, কত গল্প বলতেন। হাসি তামাশা তিনি খুব ভালবাসতেন। স্কুলের জন্ম-দিনের পিক্‌নিকে একবার মস্ত বড় ড্রাম্‌-ভর্তি রসগোল্লার দিকে তাকিয়ে শাস্ত্রীমশাই বললেন, "এই সব রসগোল্লা কে একলা খেতে পারে?" দাদা অমনি চেঁচিয়ে বলল, "আমি পারি।" তারপর আস্তে বলল, "অনেক দিন ধরে।" শাস্ত্রীমশাই খালি হো-হো করে হাসেন আর বলেন, "আরে! এ যে 'ইতি গজ' হল!" তারপর আমাদের মহা-ভারতের সেই 'অশ্বত্থামা হত—ইতি গজ' গল্পটা বললেন।

একবার ছাত্রসমাজের পার্টিতে শাস্ত্রীমশাই যেই বললেন, "উঃ, কি গরম!" অমনি এক ভদ্রলোক মস্ত একটা সিগার তাঁর দিকে এগিয়ে ধরলেন। শাস্ত্রীমশাই অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন, আমরাও অবাক হয়ে গেলাম: শাস্ত্রীমশাই যে তামাক চুরুট ইত্যাদি কিছুই খান না সে তো সবাই জানে। (তখনকার দিনে অনেকেই খেতেন না, আমাদের বাড়িতেও বড়দের কাউকে কখনও খেতে দেখিনি।) 'মুকুল' পত্রিকায় তাঁর লেখা ভারি মজার কবিতা আর তার সঙ্গে তেমনি মজার ছবি বেরিয়েছিল: একটা ছেলে খুব সিগারেট

খেত, খেতে খেতে তার হাত, পা, সমস্ত শরীরটাই সিগারেটের তৈরী হয়ে গেল—সে-সব কথা আমাদের বেশ মনে আছে। এ ভদ্রলোক কি কিছুই জানেন না? ভদ্রলোক সিগারের মাথাটা একটু টিপে দিলেন, অমনি সেটা ফট্ করে ফাঁক হয়ে গেল, আর সুন্দর রঙ্গীন একটা জাপানী পাখা বেরো। তখন শাস্ত্রীমশাইয়ের সে কি হাসি! নতুন খেলনা হাতে পেয়ে ছোট ছেলেরা যেমন খুশী হয়, তেমনি খুশী হয়ে তিনি পাখাটা নিয়ে একবার খুলছেন, একবার বন্ধ করছেন।

ছেলেপিলেদের তিনি খুব ভালবাসতেন। পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও অ য়দের বাড়ির ছেলেমেয়েরা কেমন মানুষ হচ্ছে, কে কেমন লেখাপড়া করছে, সমস্ত খবর রাখতেন। এ বিষয়ে তাঁর কি রকম আগ্রহ ছিল তার একটা গল্প মনে পড়ছে। কয়েক বৎসর পরের কথা, সেবার আমি আই. এ. পরীক্ষা বেশ ভালভাবে পাশ করেছি। পরীক্ষার ফল বেরোবার কয়েক দিন পরেই শাস্ত্রীমশাইয়ের সাংঘাতিক অসুখের খবর শুনে আমরা মা'র সঙ্গে তাঁকে দেখতে তাঁদের পদ্মপুকুরের বাড়িতে গেলাম। ভাল করে জ্ঞান নেই, আচ্ছন্নের মত বিছানায় পড়ে আছেন, মাঝে মাঝে একটু জ্ঞান হচ্ছে। হঠাৎ চোখ মেলে বললেন, "কে?" মা তাঁকে দেখতে এসেছেন শুনে কাছে যেতে ইশারা করলেন, আমরা একে একে প্রণাম করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। অত্যন্ত দুর্বল, কথা বলতে পারেন না, চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা। আমার দিকে চেয়েই হঠাৎ চোখ দুটি যেন একটু উজ্জ্বল হল। ফিসফিস করে বললেন, "ভা-ল পা-শ ক-রে-ছ, বড় খুশী হয়েছি—বেশ! বেশ!" বলেই আবার চোখ বুজলেন। আমরা তো অবাক! এত অসুখের মধ্যেও এই সামান্য কথাটি মনে রেখেছেন!

দাদামশাই নবদ্বীপচন্দ্র দাস ছিলেন মা'র 'মামাবাবু'। শ্যামবর্ণ,

গোলগাল, মাথাভরা কাঁচাপাকা চুল, একটিও দাঁত নেই, আর সেই ফোক্‌লামুখের হাসিটি ছিল চমৎকার। আমরা তাঁকে যেমন ভালবাসতাম, তাঁর সঙ্গে আহ্লাদ আব্দার করতাম, মনের কথা বলতাম, তেমনি দুষ্টুমী করতেও ছাড়তাম না। দাদামশাই মোটা ছিলেন বলে তাঁর একজন বন্ধু নাম দিয়েছিলেন, 'ঢাকাই জালা'। আমরাও অনেক সময় আড়ালে তাঁকে 'জালাবাবু' বলতাম। দাদামশাই খেতে আসছেন, চাকর তাঁর জন্য পিঁড়ি পেতে দিল, দাদা চুপি চুপি কোত্থেকে একটা বিঁড়ে এনে পিঁড়ির পাশে পেতে দিল—বিঁড়ে না হলে 'জালা' বসবে কি করে?

একদিন দাদামশাই বললেন, "হ্যাঁরে, অমুক বাড়ির ছেলেরা কেমন গড়গড় করে ইংরেজী বলে, তোরা তো অমন পারিস না?" আমরা বললাম, "ওরা যে বাড়িতে নিজেদের মধ্যেও ইংরেজীতে কথা বলে, তাই অমন বলার অভ্যাস হয়েছে। আসলে যে ওরা আমাদের চেয়ে কিছু ভাল ইংরেজী জানে তা' নয়।" দাদামশাইয়ের ভারি সাধ যে আমরাও ঐ রকম গড়গড় করে ইংরেজী বলি। নিয়ম করে দিলেন যে, আমাদেরও বাড়িতে নিজেদের মধ্যে ইংরেজী বলতে হবে। ব্যবস্থাটা আমাদের মনের মত হল না, তাই দুষ্টু বুদ্ধি এঁটে আমরা নিজেদের মধ্যে তো বটেই, দাদামশাইয়ের সঙ্গেও ইংরেজী বলতে আরম্ভ করে দিলাম। তিনি বাংলা বললে কিছু বুঝতে পারি না, ইশারায় বোঝাতে গেলেও হাঁ করে থাকি। বেচারা ইংরেজী জানেন না তো, কাজেই দু দিনেই আমাদের কাছে হার মানতে হ'ল।

দাদামশাইয়ের কি যেন অসুখ ছিল, একটা ব্যথায় বড় কষ্ট পেতেন। ওষুধপত্রেও বিশেষ ফল হত না। ডাক্তার বলেছিলেন ব্যথা হবার মত মনে হলেই কিছু খেতে, তাই তাঁর কাছে কিছু ফল, বিস্কুট ইত্যাদি সর্বদা রেখে দেওয়া হ'ত। যে-কেউ তাঁকে দেখতে

আসত, এক কোয়া কমলালেবু, একটি আঙুর, কি এক টুকরো বিস্কুট আদর করে তার মুখে তুলে দিতেন। আমরা কাছে বসে হাত বুলিয়ে দিতাম, বাতাস করতাম, কষ্ট বেশী হলেও কখনো অস্থির হতেন না। চোখ বুজে, আস্তে আস্তে ভগবানের নাম করতেন।

নিজে তিনি বিয়ে করেননি, কিন্তু লোকের বিয়ে দেবার জন্য তাঁর ভারি আগ্রহ ছিল। বন্ধুরা তাই ঠাট্টা করে তাঁকে ঘটকঠাকুর বলতেন। টাকাপয়সা তাঁর ছিল না, যেটুকু সামান্য সঞ্চয় ছিল, সব দান করে ফেলেছিলেন। নিজের ঘরসংসার তাঁর ছিল না, কিন্তু সকলের তিনি ছিলেন আপন জন, কারো 'মামাবাবু', কারো 'কাকাবাবু', ছোটদের 'দাদামশাই', বুড়োদের 'দাদা'। যার যত সংসারের দুঃখ ভাবনা অশান্তির বোঝা নিয়ে আসতো তাঁর কাছে, তিনি সান্ত্বনা দিতেন, পরামর্শ দিতেন, ঝগড়া অশান্তি মিটিয়ে দিতেন,—যেন সবাইকে নিয়ে তাঁর প্রকাণ্ড একটি সংসার।

কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাবার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। বাবার বেহালাবাজনার প্রতি তিনি অনুরাগী ছিলেন। প্রতি বৎসর জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে উৎসবের সময় বাবাকে রবীন্দ্রনাথের নতুন নতুন গানের সঙ্গে বেহালা বাজাতে হত। ছোটদের জন্য বাবা যে বই লিখতেন, তাতেও রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল। বাবার নতুন বই বেরোলেই আনন্দ প্রকাশ করে, আরো লিখবার উৎসাহ দিয়ে তিনি চিঠি লিখতেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি দেশী গল্প শেষ হলে, "বিদেশী গল্পের ভাণ্ডারেও হাত দিতে" তিনি বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন, কতগুলি বিদেশী বইয়ের নামও বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসতে দেখতাম—এখন তাঁর সাদা চুলদাড়ি ঋষির মত চেহারার ছবিই তোমরা বেশী দেখতে পাও, তখন আমরা

দেখতাম তাঁর কালো কোঁকড়ানো চুল, জোয়ান বয়েসের চেহারা। সে চেহারাও অবশ্য খুবই সুন্দর ছিল।

একদিন রবীন্দ্রনাথ বাবার সঙ্গে দেখা সেরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়ি যাবার জন্য রওনা হলেন। বাড়িটা কাছেই ছিল, তাই হেঁটেই যাচ্ছিলেন, একটু পরেই আবার ফিরে এলেন। পথে যেতে যেতে দেখেছেন, একটা মরা ইঁদুর ফুটপাথে পড়ে আছে, দেখে মনে হয় প্লেগেই মরেছে। পাশেই ছেলেপিলেরা খেলা করছে, কত লোক আসছে-যাচ্ছে, ইঁদুর থেকে যে প্লেগের ছোঁয়াচ লাগতে পারে সে খেয়াল কারো নেই। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে তিনি বাবাকে বললেন। বাবা লোক নিয়ে গিয়ে ইঁদুরটাকে কেরোসিন ঢেলে জ্বালাবার ব্যবস্থা করলেন, তবে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারলেন। কাকারা খুশী হয়ে বললেন, "দেখ! কবি শুধু ভাবেই ভুলে থাকেন না, সব দিকেই তাঁর দৃষ্টি আছে!"

আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, এঁদেরও কত সময়ে আসতে দেখতাম। আচার্য জগদীশচন্দ্রকে কেমন যেন 'ভোলা' মানুষ মনে হত। একবার তিনি আমাদের বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরবার জন্য উঠেছেন। সিঁড়ির মুখে এসে হঠাৎ কি কথা মনে পড়ে গেল, দাঁড়িয়ে আবার বাবার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। এদিকে আমাদের স্কুলের সময় হয়েছে, আমরা বইখাতা হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছি; বাবা আমাদের দিকে পিছন ফিরে আছেন বলে দেখতে পাচ্ছেন না, জগদীশচন্দ্র আমাদের দিকেই ফিরে আছেন, কিন্তু দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না। একমনে গল্প করে চলেছেন—আর এমনভাবে এদিকের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে, ওদিকের দেওয়ালে হাত রেখে, বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে, আমাদের যাবার পথও নেই। রাস্তায় বাসের গুম্‌গুম্‌ শব্দ শুনে দিদি বলল, "চল্‌, পিছনের সিঁড়ি দিয়ে যাই।" (রান্নাঘরের

দিকে একটা ঘোরানো সিঁড়ি ছিল।) টুনী আপত্তি করল, "কেন? ঘুরে যাবো কেন?" "দেখছিস্ না, উনি ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন?" "তাতে কি হয়েছে?" বলে টুনী বোঁ-ও করে জগদীশচন্দ্রের হাতের তলা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, তিনিও চমকে উঠে হেসে পথ ছেড়ে দিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখলে বোঝাই যেত না যে অত বড় একজন পণ্ডিত মানুষ। ছোটখাটো রোগা মানুষটি, মাথার চুল এলোমেলো, ঘরে-কাচা শার্টটা কুঁচকে রয়েছে, তাও আবার হাতে বোতাম নেই! দাদা আর দিদি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল, দিদি বয়েসে বড়, দাদা বেশী লম্বা, ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি 'দিদি', না, ও 'দাদা'?"

বড় হয়ে এঁদের আরো কাছে দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। বিশেষত দাদার নানাদিকে প্রতিভার উন্মেষ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, রবীন্দ্রনাথের তো বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়েছিল দাদা। তখন কিন্তু আমরা দূর থেকেই সম্ভ্রম ও কৌতূহলের সঙ্গে এঁদের দেখতাম: রবিবাবু! জে সি বোস! পি সি রায়!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সেবার পুরীতে গিয়ে আমরা প্রথম সমুদ্র দেখলাম। সকালে পুরী স্টেশনে পৌঁছবার অনেক আগেই দূর থেকে যেই নীল আকাশের গায়ে জগন্নাথ-মন্দিরের উঁচু চূড়া দেখা গেল, ট্রেনের যাত্রীদল দুই হাত তুলে জয়ধ্বনি করে উঠল, "জয় জগন্নাথ।" "জয় জগন্নাথ।" ঝাউ-গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূরে সমুদ্র দেখা গেল! "সমুন্দর্ মহারাজ"কেও তারা প্রণাম জানাল। স্টেশনে ট্রেন থামতে-না-থামতে চারদিক থেকে পাণ্ডার দল এসে একেবারে ছেঁকে ধরল। কোনো যাত্রীর ঠাকুরদাদা কিংবা তাঁর ঠাকুরদাদাও যদি কোনোদিন পুরীতে তীর্থ করতে গিয়ে থাকেন, তাহলে যে পাণ্ডা তাঁদের তীর্থ করিয়েছিল তার কাছে তাঁদের নামধাম সব লেখা থাকবে এবং তাঁদের বংশের কেউ পুরী গেলে সেই পাণ্ডা কিংবা তার উত্তরাধিকারী এসে তাঁকে তীর্থ করাবার ভার দাবী করবে। যাত্রী নিয়ে মাঝে মাঝে পাণ্ডাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি, মারামারি লেগে যায়। আমরা তীর্থ করতে আসিনি, বেড়াতে এসেছি, অনেক করে এ-কথা বুঝিয়ে বলে তবে তাদের হাত এড়ানো গেল।

বাবার অসুখ ছিল বলে সেবার মন্দিরের ভিতরে যাবার সুবিধা হয়নি। গাড়ি করে মন্দিরের চারিদিকে, নরেন্দ্র-সরোবরে, আর শহরটায় ঘুরে দেখেছিলাম। তবে সমুদ্র দেখে মনে হল, আর কিছু না দেখলেও কোনো দুঃখ নেই। ছবি দেখে আর বর্ণনা শুনে মনে মনে সমুদ্রের একটা ধারণা করে রেখেছিলাম, কিন্তু এত বিশাল আর এমন

আশ্চর্য সুন্দর, কল্পনাও করতে পারিনি। সকালবেলার সূর্যোদয় ঠিক যেন মনে হয়, সোনালী জলের মধ্যে থেকে একটা সোনার গোলা উঠে এল। দিনের বেলায় সমুদ্রের রঙ কোথাও নীল, কোথাও সবুজ, আবার মেঘলা দিনে সীসের মত রঙ। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সাদা ফেনার মুকুট, সূর্যাস্তের আকাশের লাল আভায় সমুদ্রের জল লালে-লাল। জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের আলোয় সমুদ্রের জল যেন "তরলিত চন্দ্রিকা"। কত বিচিত্র রূপ সমুদ্রের!

···প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আমাকে একেবারে চিৎ করে ফেলে দিল···

দল বেঁধে সমুদ্রে স্নান করা, ভাঁটার সময়ে হাঁটু-জলে পা ডুবিয়ে খেলে বেড়ানো, বালি দিয়ে পাহাড় ঘরবাড়ি বানানো, বালিতে ঝিনুক কুড়ানো, কাঁকড়া তাড়ানো, কতরকম মজা। চঞ্চল সমুদ্রের তীরে বড়রাও যেন আনন্দে ছোটদের মতই চঞ্চল হয়ে ওঠেন। শামুক-ঝিনুক কত রকমের, আর কি সুন্দর! প্রথম দিন তো জানা ছিল না, ঢেউ এসে আছ্‌ড়ে পড়ল, সাদা সাদা ফেনা উথ্‌লে উঠল, জল যখন সরে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে একটা সুন্দর শামুক গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে আমি ছুটে

সেটাকে যেই তুলতে গিয়েছি, অমনি আরেকটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আমাকে একেবারে চিৎ করে ফেলে দিল। পায়ের জুতো থেকে মাথার ফিতে পর্যন্ত ভিজে গেল, নোনা জলে মুখ ভরে গেল, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হ'ল।

মাছই বা কতরকম। ভোরবেলায় নুলিয়ারা নৌকা চড়ে বেরিয়ে যায়, আর অনেক বেলায় নানারকম মাছে নৌকা বোঝাই করে ফেরে। তখন তো কলকাতায় সমুদ্রের মাছ চালান আসত না, প্লেটের মত বড় চাঁদা-মাছ (পম্‌ফ্রেট্) আর গল্‌দাচিংড়ির 'ঠাকুর্দা' রাক্ষুসে চিংড়িমাছ দেখে তো আমরা অবাক। নানারকম মাছের সঙ্গে আবার দু'চারটা অদ্ভুত জীবও জেলেদের জালে উঠে আসত। নরম থল্‌থলে 'জেলি-ফিশ্', শঙ্করমাছ তো হামেশাই দেখতাম। একবার একটা উজ্জ্বল সবুজ রঙের জন্তুকে জেলেরা ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিল। বাবা সেটাকে ভাল করে দেখবার জন্য কাছে নিয়ে ঝুঁকতেই তারা চেঁচিয়ে উঠল, "বিষ্কিব-অ, বিষ্কিব-অ।" দেখতে অমন সুন্দর হ'লে কি হয়? ওকে ছুঁলেই নাকি হুল বিঁধিয়ে দেয়। একদিন একগাদা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে বাড়িতে এনে জল দিয়ে ধুচ্ছি, হঠাৎ একটা শামুকের মধ্যে থেকে একটা অদ্ভুত জীব বেরিয়ে এল। ঠিক কাঁকড়ার মত মুখ ও দাঁড়া, কিন্তু খোলা নেই। গা'টা নরম আর লম্বাটে হয়ে ডগাটা লেজের মত হয়েছে। শামুক তো নয়ই, কাঁকড়াও তো কখনো এরকম দেখিনি। বাবা বললেন, ওর নাম 'হার্মিট ক্র্যাব' অর্থাৎ সন্ন্যাসী কাঁকড়া। ওর ঐ নরম শরীরটাকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ও কোনো শামুকের খোলের মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নেয়। ঠিক যেন গুহার মধ্যে সন্ন্যাসীঠাকুর।

ওদেশের ভাষা বুঝতে প্রথম প্রথম মুশকিল হচ্ছিল, কিন্তু একটু মন দিয়ে চেষ্টা করলেই বাংলাভাষার সঙ্গে ওর অনেকটা সাদৃশ্য বোঝা

যায়, আর অল্পদিনের মধ্যেই বলতে পারা না যাক্‌, মোটামুটি বুঝতে কষ্ট হয় না। আমাদের বামুনঠাকরুণ প্রথম দিন গিয়েই ওদেশী নতুন ঝিকে কাজ বোঝাতে গেল। বাংলাভাষা সে বুঝতে পারছে না দেখে হিন্দীতে আরম্ভ করল, তাতে ঝি আরো হাঁ করে আছে দেখে রেগে মেগে বলল, "জেতের মু—খে আগুন!" সেই বামুনঠাকরুণ ক'দিনেই সারু-কখারু-বাইগন (কচু, কুমড়ো, বেগুন) শিখে নিল, আর এমন কাঁইকি-মাইকি করে মাছের দরদস্তুরী আরম্ভ করল যে, মেছুনীরা তো হেসেই গড়াগড়ি। ওরা কথার শেষে হসন্ত উচ্চারণ করে না। ভাতকে আমাদের মত ভাত্‌ না বলে, বলে ভাত্‌-অ, ডালকে বলে ডালি, ইক্‌মিক্‌ (কুকার)কে বলত ইকিমিকি। আমকে ওদেশে বলে আম্ব, কলাকে কদরী (কদলী), কাঁঠালকে বলে পনস (কাঁঠালের সংস্কৃত নাম)। পেঁপে ওদেশে খুব বড় বড় হয়, আর খুব মিষ্টি; নামটাও বেশ জমকালো—'অম্‌রুতভণ্ডা' অর্থাৎ অমৃত-ভাণ্ড। সূর্য-গ্রহণের সময় সকলে কালো কাঁচ চোখে দিয়ে দেখছে, ঝি-ও দেখতে চাইল। তার একটা চোখ কানা ছিল, এক টুকরো কাঁচ তার হাতে দিতে সে ভাল চোখটায় লাগিয়ে খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। "কি রকম দেখছো? জিজ্ঞাসা করাতে সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "মু তো এক চক্ষুরে দেখুচি, মু অধ-খণ্ড দেখুচি!"

ওখানে খাঁটিদুধ পাওয়া মুশকিল হচ্ছিল, একটা ভাল গরু কেনা হ'ল। আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে কারা যেন রোজ দুটো প্রকাণ্ড ষাঁড় ছেড়ে দিয়ে যেত, তারা সমস্তক্ষণ লড়াই করত। মাটিতে পা ঠুকে গর্জন করত, হঠাৎ শিংয়ে শিং বাধিয়ে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করে দিত। সারাদিন এই রকম চলত। একদিন দুপুরবেলায় আমরা ভিতরের বারান্দায় বসে খেলা করছি, হঠাৎ ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ শব্দ শুনে চেয়ে দেখি, সেই ষাঁড় দুটো উঠোনের খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে এসে গরুর গামলা

থেকে সপাৎ সপাৎ করে জাব্ খাচ্ছে। গরু বেচারা ভয়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে। আমরা চেঁচামেচি করতেই ঠাকুর-চাকররা লাঠি নিয়ে ছুটে এল, ষাঁড় দুটো তাড়া খেয়ে খিড়্কি দরজা দিয়ে না বেরিয়ে খটাখট্ সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে সোজা বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাবার অসুখ, খাটে শুয়ে আছেন, দুই ষাঁড় সেই খাটের চারদিকে তাণ্ডব-নৃত্য জুড়ে দিল। অনেক হৈ-চৈ, তাড়াহুড়োর পর তারা বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে লাফিয়ে মাঠে পড়েই লেজ তুলে
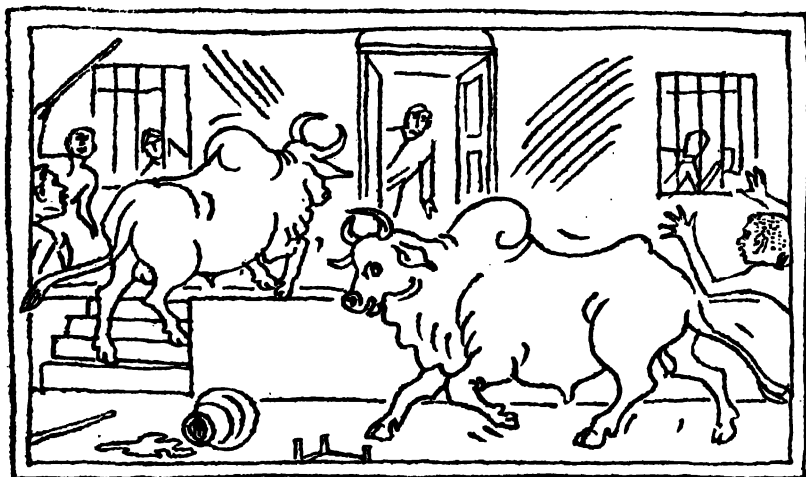
…খটাখট্ সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে সোজা বাবার ঘরে…

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। তারাই বেশী ঘাবড়েছিল, না আমরা, তা বলতে পারি না।

একদিন মন্দির থেকে 'মহাপ্রসাদ' আনিয়ে খাওয়া হ'ল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁড়ি, একটার উপর একটা চাপিয়ে দমে রান্নার মত করে নাকি রান্না হয়, ভারি সুস্বাদু খেতে। রোজ হাজার হাজার লোকের জন্য রান্না হয়, ভাতের ফেন নল দিয়ে এসে নীচে একটা লম্বা চৌবাচ্চার মধ্যে জমা হয়—রাজ্যের গরু এসে জোটে সেই ফেন খেতে। মহাপ্রসাদ

লোকে অতি পবিত্র মনে করে, তার একটি কণাও কেউ ফেলে না। তীর্থ সেরে দেশে ফিরবার সময় যত্ন করে প্রসাদ নিয়ে যায়, দু'টি দু'টি করে সবাইকে বিতরণ করে, ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে প্রত্যেকে দু'চার দানা শুকনো প্রসাদ মুখে দেয়। একটা নিয়ম বেশ সুন্দর। প্রসাদের বেলায় জাত বিচার নেই। আমাদের ঠাকুর-চাকররা কেউ কারো সঙ্গে বসে খেত না, কিন্তু প্রসাদ যেদিন এল, বাঙ্গালী, বেহারী, ওড়িয়া, বামুন-শূদ্র সবাই পাশাপাশি খেতে বসে গেল। বামুনঠাকুরটির ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারটা একটু বেশী ছিল, আজ সবাই নিজের পাত থেকে ভাত তুলে তার পাতে দিল। মা বললেন, "এই তো কেমন সুন্দর সবাই একসঙ্গে বসে খাচ্ছ, রোজ এ রকম পার না?" ঠাকুর বলল, "এ যে জগন্নাথের প্রসাদ, এ তো কিছুতেই অপবিত্র হয় না।" মা জিজ্ঞাসা করলেন, "জগন্নাথ তো সমস্ত জগতের প্রভু, সব অন্নই তো তাঁরই দান, সবই কি তাঁর প্রসাদ নয়?" ঠাকুর মাথা চুলকে বলল, "হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা। সে তো ঠিক কথা।"

বামুনঠাকুরের নাম ছিল 'ক্রুষ্ণ' অর্থাৎ কৃষ্ণ। বেশ রান্না করত, কিন্তু মাছ যতই দাও তার হাতে অর্ধেক হয়ে যেত। একদিন পরিবেশন করতে গিয়ে মা বললেন, "মাছ এত কম কেন, ঠাকুর?" ঠাকুর তাড়াতাড়ি বলল, "বেড়ালে খেয়ে গিয়েছে, মা!" নানকু অমনি খিলখিল করে হেসে বলল, "হ্যাঁ মা, আমি দেখেছি, কেষ্টো-বেড়ালে মাছ খেয়েছে।" ছোট্ট ছেলের কথায় সবাই হেসে উঠল আর কেষ্ট লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে পালাল।
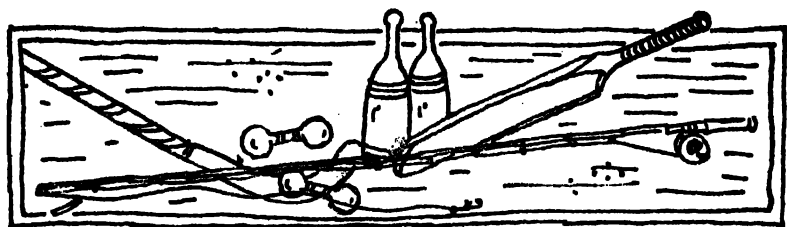
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বাবারা সাত ভাইবোন আর তাঁদের ছেলেমেয়েরা মিলে, আমরা বেশ বৃহৎ পরিবার ছিলাম। তার মধ্যে অনেকেই কলকাতায় থাকতেন, কেউ কেউ দেশে থাকতেন, কেউ বা দূরদেশে চাকরি করতেন। কোনো কিছু উপলক্ষ্যে যখন সবাই এক সঙ্গে মিলতাম, তখন যেন এক সমারোহ ব্যাপার হ'ত। একবার সবাই মিলে দেশে গিয়েছি, বাড়িতে লোক যেন ধরে না। চারদিকে হাসি, গল্প, আনন্দ, কোলাহল,—তার মধ্যে ঠাকুরমা একটা পুরনো দিনের গল্প বললেন। আমাদের প্রপিতামহ (ঠাকুরদাদার বাবা) অল্প বয়েসে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সময়ে ঠাকুরদাদার মা তাঁদের একমাত্র পুত্র শিশু ঠাকুরদাদাকে কোলে নিয়ে পাশে বসে কাঁদছিলেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রপিতামহ নাকি বলেছিলেন, "এই যে তোমার একটি রইল, এই এক থেকেই তোমার এক শ' হবে।" ঘরভরা লোকের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে ঠাকুরমা বলেছিলেন, "তিনি যদি এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে দেখতেন, তাঁর সে আশীর্বাদ সফল হয়েছে—তাঁর বংশের ছেলেমেয়েতে আজ তাঁর ঘর ভরে গিয়েছে।" সেই বংশ আর পরিবারের গল্প এখন কিছু বলি।

সে প্রায় চার শ' বছর আগেকার কথা। রামসুন্দর দেও বলে একটি যুবক তাঁর পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রাম ছেড়ে

ভাগ্য-অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি পূর্ব বাংলায় সেরপুরে এলেন। সেরপুরের জমিদারবাড়িতে যশোদলের 'রাজা' গুণীচন্দ্র যুবকের সুন্দর চেহারা আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে যশোদলে নিয়ে এলেন। সেখানে ঘরবাড়ি করে দিলেন, জমিজমা দিলেন, তারপর তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন। সেই থেকে রামসুন্দর দেও যশোদলবাসী হলেন। তাঁর বংশধররাও অনেকদিন যশোদলে ছিলেন, পরে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে মসূয়া গ্রামে এসে স্থায়ী বসবাস করেন।

ক্রমে তাঁরা একদিকে যেমন চাকরি ইত্যাদি করে সাংসারিক উন্নতি করলেন, তেমনি তাঁদের মধ্যে অনেকে বিদ্যায় ও চরিত্রে উন্নত হয়ে লোকের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করলেন। তাঁদের আসল পদবী 'দেও' (দেব) মুসলমান সরকারে কাজ করার ফলে হল 'রায়'। কেউ কেউ 'খাসনবিশ' 'মজুমদার' ইত্যাদিও লিখতেন।

এই বংশের রামকান্ত মজুমদার নানা ভাষায় পণ্ডিত, গান-বাজনায় পারদর্শী আর অসাধারণ বলশালী ছিলেন। তাঁর গায়ের জোর সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প শোনা যায়। এক ঝুড়ি খই আর একটি আস্ত কাঁঠাল নাকি তাঁর জলযোগ ছিল। একদিন তিনি ঘরের দাওয়ায় বসেছিলেন, হঠাৎ একটা বুনোশূয়োর এসে তাঁকে আক্রমণ করল। বজ্রমুষ্টিতে শূয়োরের চোঁয়াল চেপে ধরে তিনি চীৎকার করে ডাকলেন। শুনেই তাঁর ভাইপো ছুটে এলেন, তারপর খুড়ো-ভাইপোতে মিলে বিনা-অস্ত্রে শুধু খড়মপেটা করেই বুনোশূয়োরের দফা শেষ করলেন। একবার রামকান্ত একটা গরু কিনলেন, তেমন সুন্দর গরু ও-অঞ্চলে কেউ দেখেনি। নদীর ওপারে একজন দুর্দান্ত ধনীলোক ছিল, গরুটা দেখেই তার ভারি লোভ হল। রামকান্ত কয়েকদিনের জন্য ভিন্ন গ্রামে গিয়েছিলেন, সেই সুযোগে ঐ লোকটির অনুচরেরা তাঁর গরু চুরি করে

নিয়ে গেল। ফিরে এসে গরু চুরির কথা শুনেই রামকান্তর বুঝতে বাকি রইল না এ কার কাণ্ড। তখনই নৌকোয় নদী পার হয়ে সেই লোকটির বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, বাহির-বাড়ির আঙ্গিনায় তাঁর গরু বাঁধা রয়েছে। সোজা গিয়ে এক হাতে সামনের দুই পা, অপর হাতে পিছনের দুই পা ধরে গরুটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি রওনা হলেন, কেউ তাঁকে বাধা দিতে সাহস করল না। দুষ্টু লোকটি তখন বাড়ির ভিতরে ছিল, বাইরে এসে ব্যাপার শুনেই বিষম চোটপাট আরম্ভ করল—"তোরা এতগুলো লোক থাকতে একটা মানুষকে আটকাতে পারলি না? যা, এখনি দৌড়ে যা।" রামকান্ত নদীর ধারে পৌঁছে চেয়ে দেখলেন যে কতগুলো ষণ্ডা লোক তাঁর দিকে ছুটে আসছে। গরুটাকে নৌকোর সঙ্গে বেঁধে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। ঢালু পাড় বেয়ে প্রথম লোকটি নামতেই পা ধরে ঝুলিয়ে তুলে কাদার মধ্যে তার মাথা গুঁজে দিলেন। দ্বিতীয় লোকটিরও ঐ দশা হতে দেখেই বাকি লোকগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল।

রামকান্তর ছেলে লোকনাথ রায় পণ্ডিত ও সাধক লোক ছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, পারসী ভাষায় তাঁর এমন অধিকার ছিল যে, এর মধ্যে যে কোনো ভাষার বই তিনি অন্য ভাষায় অনর্গল পড়ে যেতে পারতেন, বোঝাই যেত না যে অনুবাদ করে পড়ছেন। সংসারে তাঁর মন ছিল না, তিনি যোগসাধনা করতেন। সাধন-ভজনের মাত্রা যখন ক্রমে বেড়ে চলল তখন রামকান্তর ভয় হল, পাছে ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। সেই ভয়ে একদিন তিনি লোকনাথের সাধনের গ্রন্থ আর অন্যান্য সমস্ত উপকরণ লুকিয়ে চুপি চুপি ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেলে দিলেন। মনের দুঃখে লোকনাথ সেই যে শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না। তিন দিনের দিন তাঁর মৃত্যু হল। ইনিই আমাদের প্রপিতামহ।

লোকনাথ রায়ের একমাত্র পুত্র, আমাদের ঠাকুরদাদা কালীনাথ

রায়, উদার তেজস্বী এবং সংস্কৃত আরবী ও পারসী ভাষায় পণ্ডিত বলে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। বড় বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বিচার-সভায় অনেক সময় তাঁকে মধ্যস্থ মানা হত ; মৌলবীরা কত সময়ে তাঁর কাছে আরবী ফরমানের অর্থ বুঝবার জন্য আসতেন ; আসল নাম কালীনাথ হলেও 'মুন্সী শ্যামসুন্দর' নামেই তিনি লোকের কাছে বেশী পরিচিত ছিলেন। কালীনাথ রায়ের পাঁচ ছেলে—সারদারঞ্জন, কামদারঞ্জন, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন।

জ্যেঠামশাই সারদারঞ্জন রায় একদিকে যেমন সংস্কৃত ও অঙ্কে পণ্ডিত, অন্যদিকে তেমনি শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমাদের দেশে ক্রিকেট খেলার প্রচলন আর উন্নতির চেষ্টায় তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। সাহেবরা (ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ডব্লিউ. জি. গ্রেস-এর নামে) তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ডব্লিউ. জি. অভ ইণ্ডিয়া'।

ছোটবেলায় নাকি জ্যেঠামশাইয়ের পড়াশোনায় একেবারেই মন ছিল না। খেলা করে, গাছে চড়ে, সাঁতার কেটে দিন কাটাতেন। তবে বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল বলে একবার যা পড়তেন বা শুনতেন, তাই শেখা হয়ে যেত। মিষ্টি খেতে তিনি খুব ভালবাসতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য যখন ময়মনসিংহ শহরের স্কুলে পড়তে এলেন, তখন রোজ বিকালে পাঁচ পোয়া পান্তুয়া জল-খাবার খেতেন। এর ফলে অসুখে ভুগলেন, পড়াশোনা একেবারেই হল না। পাশ করতে পারবেন কিনা বড়ই ভাবনা হল। পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে আশ্চর্য এক স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর বসবার জায়গা পরীক্ষার হলের কোন জায়গায় পড়েছে, কি রকম প্রশ্ন আসবে, স্বপ্নে স্পষ্ট দেখলেন। তাঁর সীটের পাশে একখানা আস্ত ইঁট পড়ে আছে, তাও পর্যন্ত দেখলেন। তখনই ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে রাত জেগে প্রশ্নগুলো ভাল করে

দেখে নিলেন। পরদিন পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখলেন, স্বপ্নে যা যা দেখেছিলেন সমস্তই একেবারে ঠিক। পরীক্ষায় পাশ করে তিনি বৃত্তি পেলেন। তাঁর জীবনে আরো কয়েকবার নাকি স্বপ্ন আশ্চর্য রকম ফলেছিল।

এবার ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে সারদারঞ্জন একদিকে পড়াশোনা ও অন্যদিকে ক্রিকেট খেলা এবং ব্যায়াম-চর্চার দিকে মন দিলেন। ছাত্র-জীবনে যেমন খেলায় শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন, কলেজের অধ্যাপক হয়েও আলিগড়, ঢাকা, কলকাতা, যেখানে গিয়েছেন ছাত্রদের এক দিকে যেমন যত্ন করে পড়াতেন তেমনি সমান যত্নে তাদের ক্রিকেট খেলা শেখাতেন। জ্যেঠামশাইয়ের বাড়িতে গেলে চারদিকে দেখতাম ক্রিকেট-ব্যাট হকি-স্টিক, মুগুর, ডাম্বেল, মাছ ধরার ছিপ্! কাকারাও সকলে ব্যায়াম করতেন, সকলেই ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। বাড়ির একটু বড় ছেলেদের জ্যেঠামশাই নিয়মমত ব্যায়াম করাতেন এবং খেলা শেখাতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বড় হয়ে খেলায় খুব নাম করেছে। বাড়ির চাকরদের তিনি কুস্তি শেখাতেন আর গায়ে জোর হবার জন্য তাদের হালুয়া খাওয়াতেন। প্রতিদিন তিনি হেঁটে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন, স্নান সেরে ভিজে কাপড় গামছায় বেঁধে নিজের হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসতেন।

ছিপে মাছ ধরারও তাঁর খুব শখ ছিল। ছুটির দিনে কাকাদের সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে যেতেন। যেদিন বড় বড় মাছ পাওয়া যেত, বাড়ি বাড়ি ভাগ করে পাঠানো আর নিমন্ত্রণ খাওয়ানোর ধুম পড়ে যেত।

ভাই-ফোঁটার দিন সকালে আমরা সমস্ত ভাইবোনেরা জ্যেঠা-মশাইয়ের বাড়িতে জড়ো হতাম। সেদিন আর দোকানের সন্দেশ রসগোল্লা নয়, থালাভরা কত রকম যে পিঠে-পুলি, লাড়ু, তক্তি, ছাঁচ, তার ঠিক নেই।

ঠাকুরমা যখন কলকাতায় আসতেন তখন জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ির প্রতি আকর্ষণ আমাদের বেড়ে যেত। ঠাকুরমাকে দেখবার আনন্দ, তাছাড়া তাঁর হাতের রান্না খাবার লোভটাও বড় কম ছিল না। কত রকমের সেই সব 'নিরামিষ-ঘরের তরকারী'র স্বাদ এখনও মনে পড়ে। ঠাকুরমার হাতের তিলের লাড়ু দাদা এত ভালবাসত, যখনই দেশ থেকে কেউ আসত, ঠাকুরমা লাড়ু পাঠাতে ভুলতেন না। বড় হয়ে দাদা যখন বিলাতে গিয়েছিল, সেখানেও ঠাকুরমার তৈরী তিলের লাড়ু তাকে পার্সেল করে পাঠানো হত। ঠাকুরমার যেমনি উঁচু মন ছিল, তেমনি ছিল তাঁর দয়া-মায়া বুদ্ধি-বিবেচনা। সবাই তাঁকে ভালবাসত আর খুব মান্য করত। পাড়া-গাঁয়ে বিধবা মানুষদের কত কঠিন নিয়ম উপবাস ইত্যাদি করতে হয়, ঠাকুরমা নিষ্ঠার সঙ্গে সে সমস্ত পালন করতেন, কিন্তু তিনি কুসংস্কারের বশ ছিলেন না। মা'র কাছে গল্প শুনেছি, মা যখন নতুন বৌ হয়ে প্রথম দেশে গিয়েছিলেন তখন মেয়েদের জুতো পায়ে দেওয়া দূরের কথা, জামা গায়ে দেওয়াও চল্ ছিল না। মা একে শহরের মেয়ে, তায় ব্রাহ্ম, ঠাকুরমা বললেন, "তোমার তো খালি-পায়ে থাকা অভ্যাস নেই, অসুখ করবে—তুমি জুতো পায়ে দিয়ো। তাতে কোনো দোষ হবে না।" মা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন মা'র খালি-পায়ে থাকা অভ্যাস আছে, কোনো অসুবিধা হবে না। বাবারা কায়স্থ, মা ব্রাহ্মণের মেয়ে। দেশের গুরুজনেরা অনেকে মাকে তাঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। বলতেন, "না, না, তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, পায়ে হাত দিতে নেই!" ঠাকুরমা হেসে বললেন, "বামুনের বেটিই হোক আর মুসলমানের বেটিই হোক, আমার বেটার বৌ যখন হয়েছে, আমি কেন পায়ের ধুলো দেব না?" ঠাকুরমা তিরাশি বছর বেঁচেছিলেন। প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর চুল

বিশেষ পাকেনি, দাঁত পড়েনি, পাতলা ছিপছিপে দেহখানি নুয়ে পড়েনি। বাংলা লেখাপড়া তিনি বেশ ভালোই জানতেন, ইংরাজী অবশ্য পড়েননি। একবার আমাদের একজন খুড়তুতো ভাই তার দাদাকে জিজ্ঞাসা করল, "ক্যাবেজ মানে কি?" ঠাকুরমা শুনতে পেয়ে বললেন, "আ কপাল! তাও জানিস না? ক্যাবেজ মানে বাঁধা-কপি।"

"আরে! তুমি কি করে জানলে, ঠাকুরমা?"

ঠাকুরমা হেসে বললেন, "তোরা বুঝি ভেবেছিস আমি কিছুই জানি না?" তারপর পটপট করে কতগুলো ইংরাজী কথা আর তার মানে বলে গেলেন, নাতি-নাতনীদের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেল।

আমাদের বাবা ঠাকুরদাদার দ্বিতীয় ছেলে ছিলেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল কামদারঞ্জন। তাঁর পাঁচ বছর বয়েসে তাঁর এক কাকা, ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল ও জমিদার এই রায়বংশেরই হরিকিশোর রায়চৌধুরী, তাঁকে পোষ্যপুত্র নেন। সেই থেকে তাঁর নাম হ'ল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তার কয়েক বৎসর পরে হরিকিশোর রায়চৌধুরীর নিজের একটি ছেলে হ'ল, তাঁর নাম নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (গোরাকাকা)। ইনি দেশেই থাকতেন এবং জমিদারী দেখাশোনা করতেন।

তৃতীয় ভাই মুক্তিদারঞ্জন রায় (সুন্দরকাকা) আর চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জন রায় (ধনকাকা); দুজনেই খুব ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। সুন্দরকাকার গায়ে যে অসাধারণ জোর ছিল, তাঁর চেহারা দেখে তা' বোঝা যেত না। ঠাণ্ডা মানুষ, ধীরে কথা বলেন, মৃদু হাসেন। পুরনো দিনের অনেক গল্পই তাঁর কাছে শুনেছিলাম আর শুনেছিলাম তাঁর নিজের ছেলেবেলার দুষ্টুমী ও দুরন্তপণার গল্প। সে গল্প বলবার সময়ে তাঁর মিটি-মিটি হাসির মধ্যে সেই দুষ্টু ছেলেটাকে তখনও চেনা যেত।

কুলদারঞ্জন রায়ের নাম বাঙলার শিশু-সাহিত্যে বেশ পরিচিত। তাঁর 'পুরাণের গল্প', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'অজ্ঞাত জগৎ', 'বাস্কারভিল কুকুর' ইত্যাদি বই ছোটদের খুব প্রিয়।

ছোট কাকা প্রমদারঞ্জন রায়ও ভাল খেলোয়াড় ছিলেন, কিন্তু চাকরি উপলক্ষ্যে দূরদেশে ঘুরতে হত বলে খেলার সুযোগ বেশীদিন পাননি। তবে ক্রিকেট খেলার চিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে লেখা ছিল—সামনের দুটি দাঁত ভাঙ্গা, হাতের দুটো আঙ্গুল ভাঙ্গা, কাঁধের হাড় (কলার বোন) ভাঙ্গা, হাঁটু ভাঙ্গা। ছোট কাকা চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। তাঁর কাছে 'থ্রী মাস্কেটিয়াস', 'এল্যান কোয়ার্টারম্যান', 'কিং সলোমন্‌স্ মাইন্‌স্', 'এরিক্ ব্রাইট্ আইজ্' ইত্যাদি কত গল্পই আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতাম—আবার যখন তিনি 'সার্ভে অভ ইণ্ডিয়া'র কাজে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ও বার্মার দুর্গম পাহাড় ও গভীর জঙ্গলে ঘুরতেন, সেখানকার কত বিপজ্জনক ঘটনা আর বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্পও কম রোমাঞ্চকর ছিল না। তার কিছু নমুনা তাঁর 'বনের খবর' বইয়ে আছে। ছোট কাকার হাসিটি ছিল শুনবার মত। এমন চমৎকার প্রাণখোলা হাসি খুব কম শুনেছি। বিদেশ থেকে যখন বাড়িতে আসতেন, হা-হা-হা-হা হাসিতে বাড়ি মাতিয়ে রাখতেন।

বড় পিসীমা আর তাঁর ছেলেমেয়েরা দেশেই থাকতেন ; ছোট পিসীমারা আমাদের কাছেই একটা বাড়িতে থাকতেন। পিসীমার চৌদ্দটি সন্তানের মধ্যে অনেকের জন্ম তখন হয়নি, তবু তখনও তাঁর বাড়িটি সর্বদা শিশুর কল-কাকলিতে পূর্ণ থাকত। সে বাড়ির তিন-তলায় লম্বা একটি ঘরে পিসেমশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু (এইচ. বোস) তাঁর লেবরেটরী করেছিলেন, সেখানে বসে তিনি নানারকম সুগন্ধি তৈরীর পরীক্ষা করতেন। ঘরটার দিকে গেলেই সুগন্ধ ভুরভুর করত।

কত রকমারি শিশি বোতল, রাশি রাশি ফুল, চোলাই করবার যন্ত্র, বড় বড় পাথরের খল ও হামানদিস্তা ; এক কোণে একটা সোডা তৈরীর কল, সে রকম আমরা আগে কখনও দেখিনি। হাতল টিপলেই ভুস্-ভুস্ করে নল দিয়ে সোডা-ওয়াটার বেরোত, সিরাপ মিশিয়ে আমাদের খেতে দিতেন, রুমালে জামায় সুগন্ধ এসেন্স দিয়ে দিতেন। ঘরটা যে আমাদের খুব পছন্দ ছিল, তা' বুঝতেই পারো ! ভারি আমুদে আর শৌখিন মানুষ ছিলেন পিসেমশাই। কত রকম শখই যে ছিল তাঁর। গান বাজনার শখ, ফটোগ্রাফীর শখ। প্রথম মোটর চড়েছিলাম পিসে-মশাইয়ের গাড়িতে—কলকাতা শহরের মোটর গাড়ি তখন এক হাতের আঙ্গুলে গোনা যেত, রাস্তায় মোটর গেলে লোক হাঁ করে চেয়ে থাকত। ফনোগ্রাফ (গ্রামোফোন) প্রথম পিসেমশাইয়ের বাড়িতেই দেখি, রেকর্ডও তিনি নিজেই তৈরী করতেন। তখনকার রেকর্ডগুলো এ রকম চ্যাপ্টা গোল ছিল না, চোঙ্গার মত হ'ত। দ্বিজেন্দ্রলালের গাওয়া তাঁর হাসির গান, রবীন্দ্রনাথের গাওয়া "বন্দে মাতরম্" গান পিসেমশাইয়ের নিজে-তোলা রেকর্ডে শুনেছিলাম, আর শুনেছিলাম ছোট কাকার সেই হাসির রেকর্ড। হাসির রেকর্ড আরো শুনেছি, কিন্তু ছোট কাকার সে হাসি একেবারে অতুলনীয়। ঠিক সে রকমটি আর কোথাও শুনলাম না।

বাবা, ধনকাকা, ছোট কাকা, ছোট পিসীমা ও পিসেমশাই ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। দাদামশাই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীও ব্রাহ্ম ছিলেন। আমাদের দাদামশাই যখন মারা যান তখন আমরা খুব ছোট, তাই তাঁর কথা খুব স্পষ্ট মনে নেই। মা'র বালিকা-বয়েসেই তাঁর মা মারা যান, সুতরাং দিদিমাকে আমরা চোখে দেখিনি।

মা যখন তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন, তখন কড়য়া অঞ্চলে একটা বাড়িতে তাঁরা থাকতেন। অনেক দিন পরে, একবার আমরা সেই রাস্তা দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম, বাবা

মাকে বললেন, "দেখ তো, তোমাদের সেই বাড়িটা চিনতে পারো কি না ?" ঘোড়ার গাড়ি আস্তে আস্তে চলেছে, মা ছ'ধারে চেয়ে দেখছেন। কয়েক বৎসরে জায়গাটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তবু একটা বাড়ি দেখেই মা'র চেনাচেনা মনে হল। তারপর তার উঠানে সতেজ কাঁঠাল গাছটা দেখে আর সন্দেহ রইল না। এই গাছটা দিদিমা নিজের হাতে পুঁতেছিলেন, রোজ জল দিতেন আর খুব যত্ন করতেন। মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ গাছ কতদিনে বড় হবে, মা ? আমরা কি তখন এখানে থাকবো ? কাঁঠাল খেতে পাবো ?" দিদিমা বলেছিলেন, "আমরা যদি নাও থাকি, আর কেউ তো থাকবে। তারাই এ গাছের ফল খাবে, এর ছায়ায় বসবে।" সেই গাছ এখন কত বড় হয়েছে! মা বললেন, "এখন কারা এ বাড়িতে আছে, চিনি না তো। না হলে ঐ গাছতলায় গিয়ে একটু বসতাম!" কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তিনি সেদিকে চেয়ে রইলেন, শ্যামল ছায়াশীতল সেই গাছটির মধ্যে যেন তিনি তাঁর মায়ের স্নিগ্ধ কোমল রূপেরই ছবি দেখতে পেলেন।

আমরা জন্মাবধি যে-দিদিমাকে জানি, তিনি যে মা'র বিমাতা, ছোটবেলায় সে কথা আমাদের জানা ছিল না। প্রথম যেদিন সে কথা শুনলাম, টুনী অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "সে কি! দিদিমা বুঝি তোমার নকল মা ?" 'নকল মা' কথাটা নিয়ে খুব হাসাহাসি হল।

দিদিমা ছিলেন নতুন যুগের মানুষ। আমাদের দেশের মেয়েদের উন্নতির পথে নানাদিকে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি এবং চন্দ্রমুখী বসু ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা-গ্র্যাজুয়েট, বাঙলা দেশের তিনি প্রথম মহিলা-ডাক্তার, কংগ্রেসের প্রথম মহিলা-প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। অসাধারণ কাজের লোক ছিলেন তিনি! ডাক্তারিতে তাঁর খুব সুনাম ও পসার ছিল, নানারকম দেশ-সেবা ও

সমাজসেবার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, তার উপরে দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পরে সাতটি সন্তানকে মানুষ করবার ভার সম্পূর্ণ তাঁর হাতেই পড়েছিল। রান্না, সেলাই প্রভৃতি ঘরের কাজও তিনি খুব ভাল রকম জানতেন। একটুও সময় তিনি নষ্ট করতেন না। তখন তো মোটর গাড়ি ছিল না, শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত রোগী দেখে বেড়াতে ঘোড়ার গাড়িতে অনেক সময় লাগতো। সেই সময়টা তিনি লেস বুনে কাজে লাগাতেন। একদিকে খুব সাহসী আর তেজস্বিনী, অন্যদিকে ভারি আমুদে মানুষ ছিলেন তিনি। যেখানে বসতেন হাসি গল্পে একেবারে মাতিয়ে তুলতেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলত। আমরা হাঁ করে তাঁর গল্প শুনতাম আর তাঁর সুন্দর আঙ্গুলগুলির খেলা দেখতাম। কি অদ্ভুত তাড়াতাড়ি কি সুন্দর সূক্ষ্ম লেস বোনা হচ্ছে। মামা-মাসীরা আমাদেরই সমবয়েসী, আর অনেক দিন এক বাড়িতেই ছিলাম, কাজেই খুব ভাব ছিল।

আমাদের বাড়িটা ছিল আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, অতিথি অভ্যাগত সকলেরই সুখের মিলনের জায়গা—"বারোমাসে তেরো পার্বণে"র মত ছোটখাটো কত আনন্দের উৎসব নিত্য লেগে থাকত। ভগবানের নাম গানে, প্রাণখোলা আদর যত্নে, হাসি আলাপে, গান বাজনায় সকলেই কত তৃপ্তি ও আনন্দ পেতেন। বাবার এক বন্ধু বলতেন, "এ বাড়ির মানুষগুলি সব সময়েই হাসছে—বাড়িটাও যেন হাসছে!"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

দাদা আর মনি আগেই আমাদের সেই পুরনো স্কুল সিটি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, এবার সুরমামাসী আর দিদি একসঙ্গে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে বেথুন কলেজে ভর্তি হল ; সেই সঙ্গে টুনী আর আমিও বেথুন স্কুলে পড়তে এলাম। অনেক বড় স্কুল, তার মস্ত ভারি ঘোড়ায়-টানা বাসগুলো গুম গুম শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে, মোটা মোটা থামওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ি দেখে হিংসা করে অন্যান্য স্কুলের ছেলেরা ছড়া বানায়—

> "বেথুন কলেজ
> হ্যাজ নো নলেজ
> বড়া বড়া থাম
> কুছ নেই কাম !"

আমাদের কিন্তু সেই পুরনো স্কুলের দিকে, ছোটবেলা থেকে চেনা সেই সব টিচার ও বন্ধুদের দিকেই মন টানত। তবে এখানকার একজন মাস্টারমশাইয়ের কথা খুব মনে পড়ে। তিনি বেশ ভালই পড়াতেন, কিন্তু একেবারে মাথা-পাগলা মানুষ। ক্লাসে কোনো মেয়ে আস্তে আস্তে লিখলে খিঁচিয়ে উঠতেন, "কাছিমডা !" (অর্থাৎ কাছিমের মতই আস্তে চলে।) আহ্লাদী মেয়েকে বলতেন, "কার্তিকচন্দর !" আর ন্যাকা মেয়েকে সরু গলায় আধ-আধ স্বরে বলতেন, "আম-

ছাগলের মাংছো দিয়ে অছগোল্লার অছ দিয়ে উতি কাণ্ডও !" কখন যে কিসে ক্ষেপে উঠতেন, তার ঠিক নেই, আবার একটুতেই গলে জল হয়ে যেতেন। ভারি নরম ছিল মনটা। একদিন সামান্য কারণে রেগে আমাকে আর আরো ছুটি মেয়েকে নিয়ে নীচের ক্লাসে বসিয়ে দিলেন। খানিক পরে রাগ আপনিই পড়ে গেল, তখন একগাল হেসে ডাকতে এলেন—"চল মা, ক্লাসে চল।" অন্য ছুজন মেয়ে উঠে চলে গেল, আমি কিন্তু হাঁড়িমুখ করে বললাম, "আমি যাব না তো! আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি এখানেই থাকব।" তখন কত সাধ্যসাধনা—"লক্ষ্মী মা, সোনা মা, রাগ করিস না। দেখ মা, কু-পুত্র যদি বা হয়, কু-মাতা কখনো নয়।" মা আর ফিরেও তাকায় না! হঠাৎ কেমন একটা সন্দেহজনক শব্দে চেয়ে দেখি সত্যি সত্যি ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, ছু চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কি আর করি! তখন উঠতেই হল।

দাদাদেরও একজন 'পাগলা মাস্টার' ছিলেন। উস্কোখুস্কো ঝাঁকড়া চুল আর 'গহন দাড়ি বদন ঘেরা'—সেই দাড়ি থেকে ছারপোকা বার করে ক্লাসের টেবলে ছাড়তেন। চেহারাটা বিভীষণ হলেও মানুষটি ছিলেন ছেলেমানুষের মত। তাঁর অনেক মজার গল্প দাদার কাছে শুনতাম।

একদিন তিনি ক্লাসে একজন ছুষ্টু ছেলেকে মারতে গেলেন, ছেলেটা অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। মাস্টারমশাইও পিছনে তাড়া করলেন। স্কুল-বাড়িতে ছুটো সিঁড়ি—রোগা ছেলেটা তরতর করে এ সিঁড়ি দিয়ে চারতলা থেকে একতলায় নামছে, আর ও সিঁড়ি দিয়ে একতলা থেকে চারতলায় উঠছে। পিছনে ছুমছুম করে ঝড়ের মত আসছেন মাস্টারমশাই। ধরবে কি, ছুধার থেকে সবছেলেরা বেরিয়ে হাঁ করে দেখছে। খানিক পরে হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে

ছেলেটার ঝুঁটি ধরে যখন ক্লাসে নিয়ে এলেন, বেহায়া ছেলেটা একগাল হেসে সগর্বে বলল, "আমি নিজেই ধরা দিয়েছি, স্যার আমাকে ধরতে পারেন নি।" মাস্টারমশাইও তখন হেসে ফেলে ছাত্রকে ছেড়ে দিলেন।

আরেক দিন হলঘরে বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে, মাস্টারমশাই দেখতে পেলেন একটি ছেলে যেন ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, আর কোলের উপর কিছু রেখে মাথা নিচু করে কি যেন করছে। নিশ্চয় টুকছে! ভেবে তিনি তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললেন, "তোর কোলে কি রে?" ছেলেটি চট করে জিনিসটা পকেটে পুরে বলল, "কই, কিচ্ছু না তো?" পকেটে হাত দিতেই ঠিক কাগজের মত খড়খড় করে উঠল। মাস্টারমশাই যত বলেন, "পকেটে কি আছে, দেখি?" ছেলে ততই প্রাণপণে পকেট চেপে ধরে বলে, "কিচ্ছু না স্যার, সত্যি বলছি কিচ্ছু না।" ততক্ষণে ঘরশুদ্ধ লোক হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে। খানিক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর জোর করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে জিনিসটা টেনে বার করে তিনি বিজয়ী বীরের মত সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলেন, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সবাই চেয়ে দেখল, তাঁর হাতে ছোট্ট একটি শালপাতার ঠোঙ্গা, তার থেকে টপ-টপ করে রস ঝরে তাঁর কনুই অবধি গড়াচ্ছে। টিফিন খেতে খেতে ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল, বেচারা রসগোল্লার মায়া ত্যাগ করতে না পেরে ঠোঙ্গাশুদ্ধ নিয়ে এসে লিখবার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে সেটা খাচ্ছিল।

দাদার আর মনির নতুন স্কুলে অনেক বন্ধু জুটে গেল। দুজনেই পড়াশোনায় ভাল আর শিক্ষক ও ছাত্র—সকলেরই প্রিয় ছিল। ছোটবেলা থেকেই দাদা যেমন আমাদের খেলাধুলা সব কিছুরই পাণ্ডা ছিল, তেমনি বন্ধুবান্ধব আর সহপাঠিদের মধ্যেও সে সর্দার হল। সর্দারি

করা মোটেই তার স্বভাব ছিল না, কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যার জন্য সকলেই তাকে বেশ মানত। দলের সকলে নিজে থেকেই যেন তাকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। তাকে সবাই ভাল বাসত, প্রাণ খুলে তার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত, কিন্তু তার সামনে দুষ্টুমি করতে কেউ সাহস পেত না। বড়রাও তার কথার বেশ মূল্য দিতেন।

দাদাদের স্কুলে একজন টিচার ছিলেন, খুব ভাল তবে একটু কড়া 'পিউরিট্যান' গোছের মানুষ। সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। একদিন ক্লাসে তিনি ছেলেদের বায়োস্কোপ দেখার অনিষ্টকারিতার বিষয়ে অনেক কথা বললেন, তারপর দাদাকে এ বিষয়ে তার মতামত বলতে বললেন। দাদা উঠে বলল যে, তারও মনে হয় বায়োস্কোপ বেশী দেখলে কিম্বা বাজে বাজে ছবি দেখলে অনিষ্ট হয়। তবে ভাল ছবিও অনেক আছে, সেগুলি মাঝে মাঝে দেখলে তাতে বরং উপকারই হয়। শিক্ষকমশাই যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন যে, দাদা বায়োস্কোপ দেখার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই বলবে। ক্লাসের পরে দাদা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "স্যার, আপনি কি কখনও বায়োস্কোপ দেখেছেন?" তিনি বললেন, "না, আমি ওসব দেখি না।" দাদা বলল, "আমি আপনাকে একটা ভাল ছবি দেখাতে চাই, আমার সঙ্গে যাবেন কি?" খানিক ইতস্তত করে তিনি রাজি হলেন। তারপর দাদা তাঁকে একটা ভাল ছবি (যতদূর মনে পড়ে 'লে মিজারেবল') দেখিয়ে আনল। সেই ছবি দেখে তিনি দাদাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "তুমি আমার মস্ত একটা ভুল ভাঙ্গিয়ে দিলে। বায়োস্কোপের ছবি যে এত ভাল হয়, সে ধারণা আমার ছিল না।"

আমাদের একজন আত্মীয় মাঝে মাঝে দেশ থেকে এসে আমাদের

বাড়িতে থাকতেন। ডিসপেপটিক মানুষ, মেজাজ ভারি চটা। আমরা ভয়ে ভয়ে তাঁর থেকে একটু দূরেই থাকতাম, সহজে কাছে ঘেঁষতাম না। একবার তিনি দেশে ফিরবার সময়ে একটা মাগুর মাছ নিয়ে যাচ্ছেন, পথে মাছের ঝোল ভাত খাবেন। চাকরকে দিয়ে একটা ছোট্ট টিনের মধ্যে মাছটাকে বেশ করে কর্ক-স্ক্রুর মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢোকাচ্ছেন, দাদা দেখতে পেয়ে বলল, "অতটুকু টিনের মধ্যে মাছটা কি করে আঁটবে? একটা বড় টিন নিলে হত না?"

তিনি ধমকিয়ে উঠলেন, "আবার কত বড় টিন নেব? এতখানি রাস্তা, এতবার ওঠানামা, কম হ্যাঙ্গামা!"

"তা বলে অতখানি রাস্তা ওটাকে টর্চার করতে করতে নিয়ে যাবেন?"

আর যায় কোথায়! ভীষণ রেগে চিৎকার করতে আরম্ভ করলেন, "নিজেরা মাছ মেরে খাও না? আমার বেলায় যে বড় বলতে এসেছ?"

দাদার কিন্তু ধীরভাবে ঐ এক কথা: "মেরেই তো খাবেন, কিন্তু অমন করে টর্চার করবেন না।" শেষ পর্যন্ত তিনি বড় একটা টিন নিলেন, তবে দাদা সেখান থেকে নড়ল।

ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত খৃস্টান মিশনারীদের একখানা কাগজ দাদা নিত। একবার সেই কাগজে শিক্ষিত মেয়েদের অত্যন্ত অভদ্রভাবে নিন্দা করে একজন ছাত্রের লেখা একখানা চিঠি বেরল। সকালে সেটা পড়েই দাদা কাগজখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রথমে কাগজের আপিসে গিয়ে পত্রলেখকের ঠিকানা নিয়ে তার বাড়িতে গেল: সে ছেলে স্বীকার করল যে, সে যা লিখেছে, সমস্তই মিথ্যা কথা। কারো উপর রাগ করে সে ঐ রকম লিখেছিল এবং সমস্ত কথা প্রত্যাহার করে ক্ষমা চেয়ে একখানা চিঠি তখনই লিখে দিল।

সেই চিঠি নিয়ে দাদা সম্পাদক পাদ্রীসাহেবের কাছে গেল, তাঁকে কাগজখানা দেখিয়ে বলল, "আপনাদের কাগজে এ রকম লেখা বেরোন বড়ই দুঃখের এবং লজ্জার কথা।" সাহেব ভারি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন যে, তিনি ক' দিন কলকাতায় ছিলেন না, তাতেই এ রকম হতে পেরেছে। তিনি দেখলে কখনই এ রকম অভদ্র চিঠি ছাপতে দিতেন না, এখনই তিনি এর প্রতিবিধান করবেন। (পরদিনই ঐ কাগজে সেই লোকটির ক্ষমা চেয়ে লেখা চিঠিটা ছাপা হয়েছিল, তার সঙ্গে সম্পাদকও ত্রুটি স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।) এত ঘুরে রোদে তেতে পুড়ে অনেক বেলায় যখন দাদা বাড়ি ফিরল, দাদামশাই (নবদ্বীপচন্দ্র দাস) সব শুনে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "হ্যাঁ, দ্বারিক গাঙ্গুলির উপযুক্ত নাতি বটে!"

ফটোগ্রাফির শখ এসময়ে দাদার খুব হয়েছিল। সুন্দর সুন্দর ফটো তুলে ও মজার ছবি এঁকে বিলাতে 'বয়েজ ওন পেপার', 'চামস্' প্রভৃতি ছেলেদের কাগজে পাঠাত আর কত পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র পেত। আমাদের কত রকমের ছবি দাদা তুলত; পাড়ায় অনেক বৌ মানুষ ছিলেন যাঁদের ফটো তোলবার ভারি সাধ কিন্তু দোকানে গিয়ে ছবি তোলাতে পারেন না, দাদা তাঁদের সকলের ছবি তুলে দিয়েছিল।

গান ও কবিতার নকল বা প্যারডি করতেও দাদা খুব ভালবাসত। স্কুলের প্রাইজের জন্য আমরা গান শিখছিলাম। রবীন্দ্রনাথের গানে বর্ষা বর্ণনা হচ্ছে—

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে
স্থলে জলে, নভতলে, বনে উপবনে, নদী-নদে
গিরি গুহা পারাবারে
আষাঢ়ে, নব আনন্দ উৎসব নব

অতি গভীর, অতি গভীর, নীল

অম্বরে ডম্বরু বাজে

যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে

করে গর্জন নির্ঝরিণী সঘনে

উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বর তলে।

দাদা ঠিক সেই সুরে সেই ছন্দে বর্ষার গান বাঁধলো—

বৃষ্টি বেগভরে রাস্তা গেল ডুবিয়ে

ছাতা কাঁধে, জুতা হাতে, নোংরা ঘোলা কালো,

হাঁটু-জল ঠেলি চলে যতলোকে।

রাস্তাতে চলা দুষ্কর মুস্কিল বড়

অতি পিচ্ছিল, অতি পিচ্ছিল, অতি পিচ্ছিল

বিচ্ছিরি রাস্তা

ধরণী মহা-দুর্দম কর্দম-গ্রস্তা

যাওয়া দুষ্কর মুস্কিল রে ইস্কুলে

সর্দি জ্বর বৃদ্ধি বড় নিত্যি লোকে বদ্যি ডেকে

তিক্ত বড়ি খায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

একবার জন্মদিনে আমি সুন্দর একটা খেলার টি-সেট উপহার পেলাম। বেশ কফি-পেয়ালার মত বড় বড় পেয়ালাগুলো, তাই দিয়ে ছোট ছোট ভাইবোনদের একটা পার্টি দেবার ইচ্ছা হল। মা বললেন, ছোট্ট ছোট্ট খাবার তৈরী করে দেবেন আর দাদা তাড়াতাড়ি একটা মজার ছবি এঁকে তার ব্লক করিয়ে গোলাপী কার্ডে ছাপিয়ে সুন্দর নিমন্ত্রণের চিঠি বানিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, বাবার লেখা 'কেনারাম ও বেচারাম' বলে একটা হাসির নাটক 'মুকুল' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, ভাইদের নিয়ে সেটা অভিনয় করে সবাইকে খুব আনন্দ দিল। খুব জমল আমাদের পার্টিটা। সেই থেকে ভাইবোনদের জন্মদিনের উৎসব-গুলো দাদার হাসির গান ও অভিনয়ে জমকালো হয়ে উঠল।

আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে অভিনয়ের জোগান দিতাম। পুরনো জামা-কাপড়-পর্দা থেকে জোড়া-তাড়া গোঁজামিল দিয়ে পোশাক বানিয়ে দিতাম, নিজেদের মাথার চুল কেটে গোঁফ-টিকি বানিয়ে দিতাম। সকলের উৎসাহ দেখে মা কিছু টাকা দিলেন, তাই দিয়ে দাড়ি গোঁফ পরচুলা ইত্যাদি কেনা হ'ল।

দাদার বেঁটেবামন সাজা, সে এক দেখবার মত জিনিস ছিল! দু' হাত লম্বা বেঁটেবামন টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে—মস্ত মাথায় বিরাট পাগড়ি, হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা বিশাল দাড়ি, চোখে কালো চশমা,

চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বুক, সুপুষ্ট লম্বা দুই হাত, আর ক্ষুদে হাফ-প্যান্ট পরা, বেবী শু ও মোজা পরা, ছোট্ট বেঁটে বেঁটে দুটি পা! যেমনি অদ্ভুত মজার তার চেহারা, তেমনি মজার তার হেঁড়েগলায় বক্তৃতা আর তীক্ষ্ণ চাঁচাসুরে গান। দেখেশুনে সকলে হেসে গড়াগড়ি যেত।

প্রকাণ্ড দাড়িটা কেনা হবার পরে একদিন ভারি মজা হয়েছিল। দাদা তখন বেশ লম্বা হয়েছে, সেই দাড়ি লাগিয়ে, চোখে কালো চশমা এঁটে, চোগাচাপকান পাগ্‌ড়ি পরে তার চেহারাটা বেশ জাঁদরেল দেখাল। সেই পোশাকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে গেল। ছেলেবেলার বন্ধু, তার সবই তো জানা আছে, কাজেই তার হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অনেক কিছু খবরই গণনা করে বলে দিয়ে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিল! তারপর যখন নিজের পরিচয় ফাঁস করল, তখন বন্ধুর ভারি মজা লাগল। সে বললে, "চল্ তোকে মা'র কাছে নিয়ে যাই। মা'র ভারি হাত দেখানোর বাতিক।" মাকে গিয়ে বলল, "মা, পাঞ্জাব থেকে একজন জ্যোতিষী এসেছেন, মস্ত পণ্ডিত লোক। বিলাত, আমেরিকা, সব ঘুরে এসেছেন, আশ্চর্য তাঁর ক্ষমতা। তাঁকে হাত দেখাবে?" মা তো খুব রাজি।

গম্ভীর সৌম্যমূর্তি জ্যোতিষী ঘরের মাঝখানে বসে আছেন, বাড়ির লোকেরা তাঁকে ঘিরে বসেছে। একে একে সকলের হাত দেখে তিনি এমন সব কথা বলে দিচ্ছেন যে সকলে অবাক হয়ে যাচ্ছে! (সবই তো তার জানা আছে।) জ্যোতিষীর আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে বন্ধুর মায়ের এমনই ভক্তি হ'ল যে হঠাৎ তিনি জ্যোতিষীর পায়ে ঢিপ্ করে এক প্রণাম করে ফেললেন। মায়ের বয়েসী ভদ্রমহিলা, তিনি পায়ে মাথা ঠেকাতেই তো 'গণকঠাকুর' মহা অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে প্রণাম করল আর বন্ধু একটানে তার পাগড়ি, আরেক টানে দাড়ি খুলে ফেলে হেসে বলল, "এঃ—কাকে প্রণাম করলে, মা?"

সকলেই কেমন বোকা বনে গেল, তারপর যা হাসির ধুম! ততক্ষণে দাদা সোজা বাড়িতে পিট্টান দিয়েছে।

এতদিন ছোটদের জন্য যেসব নাটক ও গল্প বইয়ে কিম্বা পত্রিকায় বেরত, তাই নিয়েই অভিনয় হত, এবার দাদা নিজেই হাসির নাটক লিখতে আরম্ভ করল। সব-প্রথমে হ'ল 'রামধন বধ' নামে ছোট্ট একটা নাটক। র‍্যাম্‌স্‌ডেন্ (রামধন) সাহেব মস্ত সাহেব, আসল সাহেবরা তার কাছে কোথায় লাগে। 'নেটিভ্ নিগার্' দেখলেই সে নাক সিঁটকোয়, পাড়ার ছেলেরাও তাকে দেখলেই চেঁচায়—"বন্দে মাতরম্!" আর সে রেগে তেড়ে মারতে আসে, বিদ্‌ঘুটে গালাগালি দেয়, পুলিস ডাকে। এহেন 'সাহেব' কি করে ছেলেদের হাতে জব্দ হল, তারই গল্প। যেমন মজার অভিনয়, তেমনি মজার গান। বিষয়টাও বেশ সময়োপযোগী হয়েছিল, সবাই খুব খুশী হ'ল।

সে সময়ে ইংরেজ গভর্নমেন্ট বাংলাদেশকে দুই ভাগ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে খুব আন্দোলন সুরু হয়েছে। এতদিন দেশের কথা নিয়ে কিছু মাথা ঘামাই নি। মনে পড়ে বছর চার-পাঁচ আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ার যুদ্ধ হয়েছিল। আমরা তখন মনে-প্রাণে ইংরেজ-ভক্ত, ইংরেজের জয় শুনলেই খুশী হই। একদিন কাগজে একটা যুদ্ধে ইংরেজেরা খুব জিতেছে দেখে আমি উৎসাহের সঙ্গে খবরটা সবাইকে শোনাচ্ছি, দাদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "নিজেরা মার খেয়ে মাটিতে পড়ে আছিস্, আবার অন্যের মার খাওয়া দেখে হাসছিস?" ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম!

এবার কিন্তু দেশের প্রতি টানটা মনে মনে বুঝতে পারলাম। দেশের সমস্ত লোকের আপত্তি অগ্রাহ্য করে জোর করে দেশটাকে দুই ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, এতে দেশের লোকের মনে খুব একটা

আঘাত লাগল। চারদিকে তুমুল আন্দোলন ও উত্তেজনা। রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করে স্বদেশী গান কীর্তন; 'বন্দে মাতরম্', 'সোনার বাংলা', 'এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে' ইত্যাদি গান ঘরে ঘরে সকলের মুখে। বড় বড় সভায় দেশনেতাদের বক্তৃতা, খবরের কাগজে ঐ একই বিষয়ে আলোচনা, লোকের মুখে ঐ একই কথা।

তিরিশে আশ্বিন বাংলাদেশকে দুই ভাগ করা হল। সেদিন সারা দেশ জুড়ে হল 'রাখী-বন্ধন'। সকাল হ'তে-না-হ'তে দলে দলে লোক গান গাইতে গাইতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন ঘুরে ঘুরে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরস্পরের হাতে একতা ও মিলনের চিহ্ন রঙ্গীন সুতোর 'রাখী' বেঁধে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করল, গভর্নমেণ্ট জোর করে আমাদের দুই ভাগ করলেও আমরা কিছুতেই ভিন্ন হব না, মনে প্রাণে এক থাকব। "বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান!"

বিকালে চারিদিক থেকে দলে দলে গান করতে করতে সকলে সার্কুলার রোডে বিরাট এক জনসভায় এসে মিলল। দেশটাকে দুই খণ্ড করলেও বাঙ্গালী জাতিটা কিছুতেই দুই ভাগ হবে না, তার চিহ্নস্বরূপ 'অখণ্ড-বঙ্গ-ভবন' তৈরী করা হবে, সেই সভায় তার 'ভিত্তিস্থাপন' হ'ল। ঠিক তার পাশেই আমাদের সেই পুরোনো স্কুলের নতুন বাড়ি হয়েছে, আমরা এবং আরো অনেক মেয়েরা স্কুল-বাড়ির বারান্দা ও ছাতে বসে সভা দেখলাম। এত অসংখ্য লোক, এমন বিরাট গম্ভীর সভা, আমরা আগে কখনও দেখিনি।

গভর্নমেণ্টের এই অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদে দেশের লোক স্থির করল যে, এবার থেকে কেউ বিদেশী জিনিস পারতপক্ষে কিনবে না। দেশী জিনিস যতই মোটা বা খারাপ হোক্ না কেন, সাধ্যমত তাই ব্যবহার করবে। তাতে একদিকে যেমন দেশী শিল্পের ক্রমে উন্নতি

হবে, অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার বিলাতী জিনিস যে আমাদের দেশে বিক্রি হয়ে লাভের টাকাটা বিদেশে চলে যায়, সেটাও বন্ধ হবে। দেখতে দেখতে স্বদেশী আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে সমিতি গড়ে উঠল, তারা দেশী জিনিসের দোকান করল, তাদের স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেরা মোট মাথায় নিয়ে গান গেযে ফেরি করতে লাগল—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই"—যতই মোটা হোক্ না কেন, লোকে আগ্রহ করে তাই কিনতে লাগল। ছেলেরা বিলাতী জিনিসের দোকানের সামনে পিকেটিং করে, কাউকে বিলাতী জিনিস কিনতে বা বিলাতী কাপড় পরতে দেখলে তার পিছনে লাগে, অতিউৎসাহের চোটে দোকান থেকে বিলাতী জিনিস টেনে রাস্তায় ফেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বিলাতী জিনিস বিক্রি একেবারে বন্ধ হবার উপক্রম।

আমরাও সমস্ত শৌখিন বিদেশী জিনিস ছেড়ে দিয়ে মোটা দেশী জিনিস ব্যবহার করতে আরম্ভ করলাম। আমাদের মধ্যে মনিরই উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। মনি ছিল ভারি গোছালো পরিষ্কার, তার পছন্দটাও চমৎকার। সেই আমাদের যত টুকিটাকি জিনিস বেছে বেছে সুন্দর দেখে কিনে এনে দিত। ছেলেবেলা থেকেই মনি ছিল ভারি পিটুপিটে। ধোপ্‌দুরস্ত জামাকাপড় নাহলে পরবে না, বাড়িতে সাবানকাচা কাপড় পরাতে গেলে নালিশ করত, "দেখ না, আমাকে বাসি কাপড় পরাচ্ছে।" পাশের বাড়ির একটি মেয়ে খেলতে এসেছিল, মনি তাকে দেখেই শিউরে উঠল, "না, না, না, ওর সঙ্গে খেল্‌বো না—ঐ দেখ্‌, ওর নাক দিয়ে শিকনী পড়ছে।" (বেচারার নাকে মস্ত একটা মুক্তোর নোলক দুল্‌ছিল।) সেই মনি এখন কোথায় দেশী সুতোর মোটা কাপড়, হাতে-তৈরী তুলোট কাগজ, ট্যারা-ব্যাঁকা পেয়ালা-পিরিচ খুঁজে-পেতে নিয়ে আসতো। দেশী জিনিস প্রথম

প্রথমে পাওয়াই মুশকিল হত, যা-ও বা পাওয়া যেত, তাও অত্যন্ত মোটা অসুন্দর। দাদা তাই ঠাট্টা করে গান লিখেছিল : 'দেশী-পাগ্লার দল'। তার মধ্যে দেশী জিনিসের বর্ণনা ছিল : 'দেখতে খারাপ, টিঁকবে কম, দামটা একটু বেশী!' ঠাট্টা করলেও, দাদাও হাসিমুখে ঐ সব মোটা জিনিস ব্যবহার করত। একদিকে যেমন হাসির গান লিখেছিল, তেমনি আবার সুন্দর গম্ভীর স্বদেশী গানও লিখেছিল : 'টুটিল কি আজ ঘুমের ঘোর?'

এর পরে দাদা একে একে কতকগুলো হাসির নাটক লিখল— 'ঝালা-পালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ইত্যাদি। সেগুলো অভিনয় করবার জন্য ভাই-বন্ধুদের মধ্যে যাদের অভিনয়ের উৎসাহ আছে তাদের নিয়ে 'ননসেন্স ক্লাব' বলে একটা দল গড়ল। 'ননসেন্স ক্লাব' থেকে 'সাড়ে-বত্রিশ ভাজা' নামে একটা হাতে-লেখা কাগজও বেরল। এখন যেমন রাস্তায় রাস্তায় নানান সুরে শোনা যায় 'চানাচুর গরম!', আমরা ছেলেবেলায় শুনতাম 'সাড়ে-ব-ত্রি-শ ভা-জা!' বত্রিশ রকমের ভাজাভুজি এবং মশলা নাকি তার মধ্যে থাকত, তার উপরে আধখানা ভাজা লঙ্কা বসানো, তাই 'সাড়ে-বত্রিশ!' কাগজের সম্পাদক দাদা; মলাট ও মজার মজার ছবিগুলো সব দাদার আঁকা, অধিকাংশ লেখাও দাদারই। অন্যদের লেখাও থাকত, হাসির কথা ছাড়া গম্ভীর বিষয়ে লেখাও থাকত, কিন্তু দাদার লেখাই ছিল তার প্রাণ। বিশেষ করে 'পঞ্চ-তিক্ত পাঁচন' নামে সম্পাদকের পাঁচ-মিশালী আলোচনার পাতাটি বড়রাও আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন; 'পঞ্চ-তিক্ত' নাম হ'লেও সেটা কিন্তু মোটেই তেতো ছিল না, বরং খুব মুখরোচক ছিল। দাদার ঠাট্টার বিশেষত্বই এই ছিল যে, তাতে কেউ আঘাত পেত না, কারো প্রতি খোঁচা থাকত না, থাকত শুধু মজা, শুধু সহজ নির্মল আনন্দ।

'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র অভিনয় এমন চমৎকার হত, যারা নিজের চোখে দেখেছে তারাই জানে। মুখে বর্ণনা করে তার বিশেষত্ব ঠিক বোঝানো যায় না। বাঁধা স্টেজ নেই, সীন নেই, সাজসজ্জা ও মেক্‌আপ্‌ বিশেষ কিছুই নেই, শুধু কথায়, সুরে ভাবে-ভঙ্গীতেই তাদের অভিনয়ের বাহাদুরি ফুটে উঠত। দাদা নাটক লিখত, অভিনয় শেখাত, আর প্রধান পার্টটা সাধারণত সে নিজেই নিত। 'প্রধান' মানে সবচেয়ে বোকা আনাড়ির পার্ট! হাঁদারামের অভিনয় করতে দাদার জুড়ি কেউ ছিল না! অন্য অভিনেতাদের মধ্যেও অনেকেরই হাসাবার ক্ষমতা খুব ছিল। অভিনয় করতে ওরা নিজেরা যেমন আমোদ পেত, তেমনি সবাইকে আমোদে মাতিয়ে তুলত। চারদিকে উচ্ছ্বসিত হাসির স্রোত বইয়ে দিতো। ছোট বড় সকলেই সমানে সে আনন্দ উপভোগ করত, নন্‌সেন্স ক্লাবের অভিনয় দেখবার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে থাকত। এমনি করে নন্‌সেন্স ক্লাব বেশ জমে উঠল। ততদিনে আমরাও তো আর 'ছোট' রইলাম না, স্কুলের পড়া শেষ করে একে একে কলেজের দরজায় পৌঁছলাম। সুতরাং ছেলেবেলার গল্প আমার এইখানেই ফুরাল।

কিন্তু, ফুরিয়ে তো যায়নি! তারপরে আরো অর্ধ-শতাব্দী কেটে গিয়েছে—যাঁদের কোলে জন্ম নিলাম, যাঁদের স্নেহের ছায়ায় বড় হলাম, যারা ছিল ছেলেবেলার খেলাধূলা, হাসিকান্না, আশা-উদ্যমের নিত্যসাথী, সেই সব মানুষের মধ্যে কতজন আজ কত দূরে চলে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সকলের স্মৃতি নিয়ে মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ছেলেবেলার সেই মধুর আনন্দময় দিনগুলি!

স মা প্ত

পরিশিষ্ট

১ম পৃষ্ঠা ১ম পংক্তি	আমাদের বাড়ি : ১৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরের সামনেই প্রকাণ্ড পুরোনো বাড়িটি।
১ম পৃষ্ঠা ৩য় পংক্তি	আমাদের স্কুল : ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়।
১ম পৃষ্ঠা ৪র্থ পংক্তি	দাদামশাই : নারীকল্যাণ-ব্রতী, স্বদেশ ও সমাজ সেবক ৺দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। মাত্র ১৬।১৭ বৎসর বয়েসে নিজের গ্রাম ও তার চারপাশে কুলীন মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি আহত বোধ করেন এবং তখন থেকেই মনে সংকল্প করেন যে, এঁদের দুঃখ দূর করতে হবে। সারাজীবন তিনি স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার ও সমাজসংস্কারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।
১ম পৃষ্ঠা ১৬শ পংক্তি	বাবা : লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী, সাহিত্যিক ও কলাবিদ্ ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। বাংলার শিশুসাহিত্য রচনায় তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। তাঁর সরস সরল সুমধুর ভাষায় লেখা বইগুলি ও তাঁর আঁকা মনোহর কৌতুককর ছবিগুলি আমাদের শিশুসাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ। ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর ছবি তৈরী ও মুদ্রণে তিনি যে শুধু পথপ্রদর্শক ছিলেন তা' নয়—এক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের মূল্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার চিত্রমুদ্রণশিল্পী-মহলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।
১ম পৃষ্ঠা ১৬শ পংক্তি	মা : ৺দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, ৺বিধুমুখী রায়চৌধুরী।
৪র্থ পৃষ্ঠা ১০ম পংক্তি	দিদিমা : ভারতের প্রথম মহিলা-গ্র্যাজুয়েট্, ডাক্তার ৺কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

৪র্থ পৃষ্ঠা ১৩শ পংক্তি জংলুমামা : ৺দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর চতুর্থ পুত্র, সুলেখক ও সুবক্তা প্রভাংশুচন্দ্র গাঙ্গুলী।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ৫ম পংক্তি চামিমাসী : ৺দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর তৃতীয় কন্যা, দেশ সেবিকা ৺জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী (ডাকনাম : চামেলী)। ইনি কলকাতা, জলন্ধর, সিংহল প্রভৃতি নানা জায়গায় মহিলা-কলেজের ও নারীকল্যাণ-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষতা করেছিলেন। দেশসেবার কাজে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ ও অনেক ত্যাগস্বীকার করেছিলেন।

৭ম পৃষ্ঠা ১ম পংক্তি দিদি : বাংলার শিশুসাহিত্যে সুপরিচিতা সুলেখিকা শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও।

৭ম পৃষ্ঠা ৮ম পংক্তি দাদা : ৺সুকুমার রায়, যাঁর অপূর্ব হাসির লেখা ও ছবি বাংলার ছেলেমেয়েদের প্রাণে নির্মল আনন্দের উৎস খুলে দিয়েছে। অসামান্য প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন, নানাদিকে সে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের আরম্ভেই অকালে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি শিশুসাহিত্যে যে দান রেখে গিয়েছেন, তার তুলনা নেই।

৯ম পৃষ্ঠা ১ম পংক্তি সুরমামাসী : সুরমা ভট্টাচার্য, পরে প্রমদারঞ্জন রায়ের (ছোটকাকা) সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। এঁদেব কন্যা শ্রীমতী লীলা মজুমদারের নাম কে না জানে?

৯ম পৃষ্ঠা ৯ম পংক্তি সুরমামাসীর বাবা : ৺রামকুমার (ভট্টাচার্য) বিদ্যারত্ন (পরে রামানন্দ স্বামী)।

১০ম পৃষ্ঠা ২৩শ পংক্তি সুন্দরকাকা : বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ৺মুক্তিদারঞ্জন রায়। ইনি ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন।

১১শ পৃষ্ঠা ৪র্থ পংক্তি ভুলুমামা : ৺দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর পুত্র ৺নির্মলচন্দ্র।

১১শ পৃষ্ঠা ১২শ পংক্তি মংলুমামা : ৺দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর পুত্র ৺প্রফুল্লচন্দ্র।

১২৮ পৃষ্ঠা ৯ম পংক্তি ছোটকাকা : ৺প্রমদারঞ্জন রায়। ইনি "সার্ভে অভ ইণ্ডিয়া" বিভাগে কাজ করতেন, সেই উপলক্ষ্যে তাঁকে বর্মা ও সীমান্তপ্রদেশের দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল গভীর বনজঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরতে হ'ত, সেই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী তাঁর "বনের খবর" বইয়ে অতি সুন্দর চিত্তাকর্ষক ভাষায় তি.নি বর্ণনা করেছেন।